এখন ডুয়ার্স

১৫ জুন ২০১৬। ১২ টাকা

উত্তরের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ

- গৌতম এখন রাজ্যহীন রাজা !
- ওজনদার পদ পেতে মরিয়া উদয়ন ?
- সাতে ছয় দিয়েও অভিভাবকহীন জলপাইগুড়ি
- বখশিসে সন্তুষ্ট নয় আলিপুরদুয়ার

নারী ও শিশুরা নিরাপদ নেই দক্ষিণ দিনাজপুরে

আলিপুরদুয়ার জেলার দুই বছর: বহু পথ চলা বাকি

facebook.com/ekhondooars ফেসবুকে যোগ দিন ও বন্ধুদের **invite** করুন

ছন্দে ডুয়ার্স

সবুজ পাতা ঝল্‌মলালো জন্মদিনের কেকে
উন্নয়নের স্বপ্ন এখন সৌরভে যায় ঢেকে
সিঞ্চুলারই ছায়ায় আঁকা অতীতখানাও হাসে
অনেক চাওয়ার পথটি ধরে পঁচিশে জুন আসে!

পর্যটনে এগিয়ে গেছি, আরো অনেক বাকি
আমরা যেন বন-পাহাড়ের সঙ্গে মিশে থাকি
চিলাপাতার রূপ মিশেছে গহন ইতিহাসে
রক্ষা করার দৃপ্ত চাওয়া পঁচিশে জুন ভাসে!

বক্সাদুয়ার বন্দীশিবির বিশ্বভুবন চিনুক্‌
জয়ন্তীরই মেঘ এসে আজ স্বপ্নগুলি কিনুক্‌
ভাসবো না আর কেউই জেনো
কালজানিটার বানে
সত্যিকারের বাঁধন যেন পঁচিশে জুন আনে!

আকাশ জুড়ে উড়িয়ে দিলাম স্বপ্নআঁকা চিঠি
হাসপাতাল হোক্‌ মাল্টি এবং সুপার
স্পেশালিটি
একটিও নেই মহকুমা - হবার সময় হল
অনেক গড়ার শপথ নিয়েই পঁচিশে জুন এল!

বিশ্ববিদ্যালয়ের চাবি এবার যেন মেলে
মেধাবী যাক্‌ এই জেলারই নতুন মেডিকেলে
এই জেলাতেও ইঞ্জিনিয়ার তৈরি যেন হয়
পঁচিশে জুন নিছক একটা তারিখ কিন্তু নয়!

সাহিত্যে হোক আবার সেরা,
নাচ-কবিতা-গানে
আবার সবাই ফিরব সেসব গৌরবেরই পানে
নতুন নতুন ভাবনা আসুক্‌ ডুয়ার্স উৎসবে
প্রতিটি দিন গড়ার নেশায় পঁচিশে জুন হবে!

ছন্দে ঃ অমিত কুমার দে
ছবিতে ঃ উতঙ্ক দে

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী ডুয়ার্স পরিচালনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৫ জুন ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৪

এখন ডুয়ার্স
আলিপুরদুয়ার এখনও বহু পথ চলা বাকি ৫

রাজনীতির ডুয়ার্স
উত্তরের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ শুরু ১১
দূরবিন ১১
ওজনদার পদ পেতে মরিয়া উদয়ন! ১৩
জেলার দখল কতটা রাখতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ? ১৩
বখশিসে সন্তুষ্ট নয় আলিপুরদুয়ার ১৪
‘ব্যতিক্রমী’ বিধায়ক ১৫
অভিভাবকহীন জলপাইগুড়ি ১৫

আলিপুরদুয়ার স্পেশাল
মঘা দেওয়ানির স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৭
সংস্কৃতির ভুবনে সঞ্চিতার অবাধ বিচরণ ৩৯

প্রতিবেশীর ডুয়ার্স
নারী ও শিশুরা নিরাপদ নেই ২০
জাল নোট ও অস্ত্র কারবারের স্বর্গরাজ্য ২৪
শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও বহাল ২৬

পর্যটনের ডুয়ার্স
মউয়ামারি ৩৪

নিয়মিত বিভাগ
বইপত্রের ডুয়ার্স ৯
খুচরো ডুয়ার্স ২২
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৫
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৩৫, ৪১
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৭
তরাই উৎরাই ২৯
লাল চন্দন নীল ছবি ৩১

শ্রীমতী ডুয়ার্স
স্মৃতির ডুয়ার্স ২৭
এবারের শ্রীমতী ৩৮
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪০
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৩

ডুয়ার্সের কফি হাউস এখন জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

facebook.com/aaddaghar

জলপাইগুড়ি শহরে আবার উন্নয়নের বান

সওয়া শতাব্দী অতিক্রান্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভার ইতিহাসে এই প্রথম সার্থক বান ডেকেছে। এ বান উন্নয়নের। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস পৌরসভার উন্নয়নের তরীর পালে লাগিয়েছে সুবাতাস। শহর জলপাইগুড়ি আজ নিশ্চিত হয়েছে তাঁর ভবিষ্যতের প্রশ্নে। পুরবাসী জানেন যে, তাঁর প্রিয় শহর, অতীত বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের নতুন রাজধানী বহুদিনের বঞ্চনার গ্লানি আর হতাশা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে উন্নয়নের কিরণছটায়।

সত্যিই আজ পুরবাসীর পায়ের নিচের রাস্তা সুনির্মিত, প্রশস্ত এবং পথবাতির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। রাজবাড়ির দীঘি সংস্কারের কাজ হয়েছে তড়িৎগতিতে। সেজে উঠেছে জুবিলী পার্ক। পুনস্থাপিত ঠাকুর পঞ্চাননের মূর্তি পেয়েছে প্রাপ্য সম্মান। সাফাই কর্মীদের তৎতরতায় পরিচ্ছন্ন শহর। অভাবিত গরমের দিনগুলিতে চব্বিশ ঘণ্টা অক্ষুণ্ণ পানীয় জলের সরবরাহ। রাস্তা ভিজিয়ে দিতে নিরলস ভ্রাম্যমান জলগাড়ি।

আরও আছে। গতিময় কর আদায়। সুচিন্তিত নাগরিক পরিষেবা। দ্রুত শংসাপত্র সরবরাহ। এক বছরের কিছু বেশি আগে আসা নতুন পুর বোর্ড উত্তরের এই বিশিষ্ট শহরকে কী দ্রুত বদলে দিচ্ছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এর পেছনে রয়েছে পুরপতি শ্রী মোহন বোসের সুযোগ্য নেতৃত্বে কর্মরত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সদাজাগ্রত নজরদারি। আর এর অনুপ্রেরণা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরবাসীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উন্নয়নের। যে বাঁধ এতদিন আটকে রেখেছিল উন্নতির স্রোত, তা তিনি ভেঙে দিয়েছেন। শহরের শুকনো খাতে এখন প্লাবন। কিন্তু এ প্লাবন ধ্বংসের নয়, জলপাইগুড়িকে পুর কর্পোরেশনে নিয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ। এ প্লাবন ভাঙনের নয়, করলা নদীকে রূপসী করে তোলার ব্রত। এ প্লাবন হাহাকারের নয়, শরতের নীল সাদা রঙে সেজে ওঠা স্পোর্টস কমপ্লেক্স আর ইন্ডোর স্টেডিয়ামের হাত ধরাধরি করে থাকার হাসি।

শুনতে স্বপ্ন মনে হলেও এ আসলে মা মাটি মানুষের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পৌরবোর্ডকে ঘুমিয়ে থাকতে দেয় না। অফুরান কাজের নেশায় জাগিয়ে রাখে। এলইডি-র নরম আলোয় লালন করে স্বপ্নকে। শহরবাসী আমাদের শক্তি। উন্নয়নের পতাকাকে বহন করার শক্তি। আসুন গলা মিলিয়ে বলি —

করলা মোদের টেমস এবং তিস্তা মোদের গঙ্গা।
মা মাটি মানুষ বদলে দেবে উন্নয়নের সংজ্ঞা।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতি পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

উত্তরে এই পর্যটক স্রোতে লাভ কার?

গত কয়েক বছর ধরে উত্তরবঙ্গে যেভাবে রেলযাত্রীর পরিমাণ বেড়েছে, তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, অন্য কোনও কারণ না থাকলেও উত্তরে পর্যটকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এ বছর নির্বাচন পরবর্তী গ্রীষ্মের অবকাশে যে যাত্রীর ঢল নেমেছে তা সম্ভবত এ যাবৎ সবরকম রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। খাঁটি পরিসংখ্যান পাওয়ার উপায় সরকারি বা বেসরকারি কোনওভাবেই নেই, তবু খালি চোখের আন্দাজে এটুকু দাবি করতেই পারেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। দার্জিলিং ম্যাল বা কালিম্পঙের পথেঘাটে দেখা গিয়েছে পর্যটকের স্রোত। কেবল তা-ই নয়, ডুয়ার্সের রিসর্টগুলোও ছিল ভরা, যা গরমের ছুটিতে কখনওই আশা করা যায় না। বলাই বাহুল্য, নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে সরকার গঠন হওয়ায় মধ্যবিত্তের মনে খানিক নিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই সরকার থাকলে পাহাড়ে আর গন্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে মানুষ। তার ফলেই এই অভূতপূর্ব জনসমাগম। নিঃসন্দেহে এটিকে সরকারের সাফল্য বলেই দাবি করতে পারেন শাসকদল ও সমর্থকরা।

কিন্তু এই পর্যায়ে কতকগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসছে, যা বোধহয় বিশ্লেষণ করার সময় হয়েছে। এই যে বিশাল পর্যটকসংখ্যা এবারের ছুটিতে উত্তরবঙ্গে এসেছে, তাদের সুবিধের জন্য সরকারি পরিষেবা কতটা কার্যকর করা গিয়েছে? নিউ জলপাইগুড়িতে প্রাইভেট ট্যাক্সিওয়ালাদের যাত্রী হয়রানি কতটা কমানো গিয়েছে? পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে সরকারি পর্যটন বিভাগের 'পর্যটক বন্ধু' জাতীয় পরিষেবা আদৌ কতটুকু চালু ছিল? পর্যটকের সংখ্যা, ব্যয়ের পরিমাণ, পছন্দ-অপছন্দ, সমস্যা ইত্যাদির খোঁজ আদৌ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল কি? ভিন রাজ্যের পর্যটক কি বেড়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর সব ক'টি নেতিবাচক হলেও তা পর্যটকের সংখ্যায় আগামীতে হয়ত কোনও প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু নতুন সরকারের আগামী দিনের পর্যটন কর্মসূচি নির্ধারণে তা যে অনেকটাই সাহায্য করতে পারত, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এসবের চাইতেও বড় প্রশ্ন হল, পর্যটকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়লেও এতে স্থানীয় মানুষ উপকৃত হচ্ছেন কতটা? পাহাড়ে হোটেল-রিসর্টগুলোর সিংহভাগই লিজ নিয়ে বসে আছেন সমতলের ব্যবসায়ীরা কিংবা পাহাড়েরই কোনও ধনী ব্যক্তি। ভাড়ার গাড়িগুলোর ক্ষেত্রেও তা-ই। এতে পর্যটকদের ব্যয় করা অর্থ কিন্তু ফেরত চলে আসছে সেই কলকাতাতেই। সরকারি রাজস্বের পরিমাণই বা এতে কতটা বাড়ছে? যেমন শিলিগুড়ি শহরের উপর বছরে ছুটির ক'টা দিন চলে বিপুল সংখ্যক পর্যটকের চাপ। বস্তুত কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকা-খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয় এই শহরের পথঘাট, শৌচালয়, হোটেল ইত্যাদি। তার জন্য শিলিগুড়ি পৌরসভার রাজস্ব ভাণ্ডারে কি কোনও অর্থ যোগ হয়? উত্তর, না। গ্রামীণ মানুষগুলোর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা অনেকটাই বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে হোমস্টে পর্যটন প্রবল জনপ্রিয় হওয়ায়। কিন্তু সেখানেও সরকারি কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, আজও তৈরি হয়নি কোনও কঠোর গাইডলাইন। কলকাতার কিছু পর্যটন সংস্থা 'অতিথি' পাঠিয়ে মোটা কমিশন রোজগার করছেন ঠিকই, কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব মেটাতে এগিয়ে আসছেন না কেউই।

আসলে সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য কোনও পরিষেবা কিংবা নজরদারির ব্যবস্থা না করছেন, ততক্ষণ পর্যটকদের কাছ থেকে কোনও শুল্ক বা কর প্রত্যাশা করতে পারেন না। ততদিন হাজার হাজার পর্যটক সমাগম ঘটলেও এতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটছে— এ দাবি করা যায় কি? নতুন পর্যটন মন্ত্রী এ নিয়ে খানিক ভাবনাচিন্তা শুরু করতে পারেন কি?

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার এখনও বহু পথ চলা বাকি

ঘটনা ১: আলিপুরদুয়ার জেলা সদর থেকে প্রায় ৭০ কিমি দূরে বান্দাপানি চা-বাগান। প্রায় তিন বছর হতে চলল বাগানটি বন্ধ। তিনটি পাহাড়ি নদী পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় বাগানটিতে। বর্ষাকালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বাগানটি। বছর দেড়েক আগে এক ঝড়জলের রাতে ওই বাগানেরই এক মহিলা চা শ্রমিকের প্রসববেদনা শুরু হয়। মাত্র ১৫ কিমি দূরে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। কিন্তু প্রসূতিকে নিয়ে ওই রাতে বর্ষার ভয়ংকর নদী পার হতে পারেনি তার পরিবার। পথেই মৃত্যু হয় প্রসূতির।
ঘটনা ২: জেলা হাসপাতালের মর্যাদা পাওয়া আলিপুরদুয়ার হাসপাতালেই রয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্ক। তবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্লাড ব্যাঙ্কে শুরু হয়েছিল রক্তের আকাল। নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল এক প্রসূতির। হাসপাতাল চত্বরে থাকা এক শ্রেণির দালালের খপ্পরে পড়ে ওই প্রসূতির পরিবার। তারা দুই ইউনিট ব্লাডের দাম চায় ১০ হাজার টাকা। অত টাকা দিয়ে রক্ত কেনার ক্ষমতা নেই তাদের। অবশেষে স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে তাদের। রক্ত পেয়ে বেঁচে যায় প্রসূতি ও নবজাতক।
ঘটনা ৩: এবারও ঘটনাস্থল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল। মৃতের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের একাংশের হাতে মার খেতে হয় হাসপাতালেরই দায়িত্বশীল এক চিকিৎসককে। অভিযোগ ছিল ভুল চিকিৎসার। তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকমহল সে অভিযোগ মানতে চাননি।
ঘটনা ৪: গত দু'বছর ধরে রেফার হাসপাতালের তকমা জুটেছে জেলার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালটির। কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ চা-বাগান এলাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে প্রায় ৬০ কিমি পথ পেরিয়ে গুরুতর অসুস্থ এক রোগীকে নিয়ে আসা হল আলিপুরদুয়ারে। হাসপাতালে ভরতির পরদিন চিকিৎসকরা বোঝেন, এ হাসপাতালে আর চিকিৎসা সম্ভব নয়। রোগীকে রেফার করা হল জেলা সদর থেকে প্রায় ২০০ কিমি দূরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। যাত্রাপথের ধকল নিতে পারেনি রোগী। পরিণামে পথেই মৃত্যু।

এমন আরও বহু ঘটনা প্রায়শই ঘটছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। অভিযোগ কিন্তু মহকুমা থেকে জেলা হাসপাতালে উন্নীত হওয়ার পরও। বেড়েছে বই কমেনি। তবে এটাও ঠিক, গত এক বছরে একের পর এক সিসিইউ ইউনিট, ডায়ালিসিস ইউনিট, সিটি স্ক্যান— এসব চালু হয়েছে। সম্প্রতি বসেছে ডিজিটাল এক্স-রে। তবে মূল সমস্যা জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে। তাই অনেকেই খুব স্পষ্ট করেই জানালেন, ২০১৪ সালের ২৫ জুন জেলা ঘোষণা হলেও প্রায় দু'বছর পরও আলিপুরদুয়ার সর্বার্থে জেলা হয়ে উঠতে পারেনি। কেবল আলিপুরদুয়ার জেলার ২০ লক্ষ মানুষই নন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান ও নিম্ন আসামের কোকরাঝাড় জেলা মিলিয়ে কমবেশি আরও পাঁচ লক্ষ মানুষ সরাসরি নির্ভরশীল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের উপর। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, এত সংখ্যক মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালই কি যথেষ্ট? নাকি প্রয়োজন আরও অন্তত দু'টি মহকুমা স্তরের হাসপাতাল? জেলার চা-বলয়ে প্রায় ৮০টি ছোট-বড় চা-বাগান। হাজার হাজার চা শ্রমিক

অনিল অধিকারী
বিধায়ক, ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ারকে পূর্ণাঙ্গ জেলার রূপ দেওয়ার কাজ লাগাতার চলছে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই কাজ সম্পূর্ণ হবে। বহু কাজই ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। কিছু কাজ বাকিও আছে। সেগুলি তুলনামূলকভাবে কম, তবে তাও শীঘ্র সম্পন্ন হবে। জেলার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে মাথায় রাখতে হবে, বয়স মাত্র দু'বছর। কিন্তু তাতেও প্রশাসনিক স্তরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে এবং যে যে কাজ গতির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তা অভাবনীয়। বলা দরকার, জেলার জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ২৫ জুন মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ারে আসার কথা। বলা বাহুল্য যে, সে দিনও তিনি আলিপুরদুয়ারকে আরও উন্নয়নশীল জেলায় পরিণত করার জন্য একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করবেন।

জেমস কুজুর
মন্ত্রী ও বিধায়ক, কুমারগ্রাম

মাত্র দু'বছর হতে চলল আলিপুরদুয়ারকে জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে আলিপুরদুয়ারে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। তার আগে কয়েক দশক যাবৎ এখানে উন্নয়নের নাম-গন্ধ ছিল না। এত সহজে আর কম সময়ে একটি বিরাট ও বৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চল কি পূর্ণাঙ্গ জেলার রূপ পেতে পারে? কাজ একবার যখন শুরু হয়েছে, তখন তা সম্পূর্ণ হবেই। এখনও প্রচুর কাজ বাকি কুমারগ্রাম ব্লকে। যেহেতু আমি ওই জায়গাটিকে ভাল করে চিনি-জানি, তাই বলতে পারছি। অভাব রয়েছে রাস্তাঘাট, পানীয় জল ইত্যাদির। বিশেষ করে এ অঞ্চলগুলির চা-বাগানগুলির লাইনের অবস্থা খুবই খারাপ। উন্নয়নের ছোঁয়া সম্পূর্ণ পড়েনি আলিপুরদুয়ার ১ ও ২ নং ব্লকে। সবেমাত্র দায়িত্ব পেয়েছি, বাকি কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করব।

কি চিকিৎসা পরিষেবা ঠিক ঠিক পাচ্ছেন?

জেলা হাসপাতাল ও নতুন জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে আলিপুরদুয়ারেরই বহু সংগঠন। পাশাপাশি রাজনৈতিক দল থেকেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। দুঃখজনক কিংবা মর্মান্তিক ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ধরনেরও অনেক প্রস্তাব এসেছে। গণসংগঠন, আলিপুরদুয়ার রেড ক্রস, অভিভাবক মঞ্চ থেকেও পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন প্রস্তাব। প্রায় সকলেই একটি বিষয় জোর দিয়ে জানিয়েছেন, জেলা হাসপাতালে যতজন চিকিৎসক থাকবার কথা, তার তুলনায় চিকিৎসকসংখ্যা অর্ধেক। মাত্র ৫২জন। জেলা সদর হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হলে অন্তত ৯০ জন চিকিৎসক আবশ্যক। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক, প্যাথলজি বিভাগেও কর্মীর অভাব। হার্টের চিকিৎসা, স্নায়বিক চিকিৎসারও উপযুক্ত কোনও পরিকাঠামো নেই।

হাসপাতাল চত্বরে দালালচক্র সক্রিয়— এই অভিযোগ নতুন নয়। দাবি উঠেছে, নার্স ছাড়া বাকি সকলেরই হাসপাতালের ভিতর সচিত্র পরিচয়পত্র থাকুক। লক্ষণীয়, সদর হাসপাতালের চারদিক খোলা। নেই কোনও ফেন্সিং বা প্রাচীর। যত্রতত্র মানুষ, যানবাহন চলছে স্পর্শকাতর প্রায় ১ বর্গকিমি এলাকার ভিতর। উপযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীরও অভাব। গোটা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকাল সকাল যে মানুষগুলি এসে আউটডোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন, হাসপাতালের ওই অংশটুকু কি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা দাবি করে না? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর হিসাব, গড়ে প্রতিদিন ৭০০-১০০০ মানুষ আউটডোরে চিকিৎসা করাতে আসেন।

কেবল জেলা হাসপাতালই যথেষ্ট নয়, আলিপুরদুয়ার জেলায় আরও অন্তত দু'টি মহকুমা পর্যায়ের হাসপাতাল তৈরির দাবি উঠেছে। চা-বলয়ের মানুষদের জন্য কালচিনি, দলগাঁও, বীরপাড়াতে হাসপাতাল তৈরির দাবিও দীর্ঘ দিনের। জেলা জুড়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর চিত্রটি হল— ৬টি ব্লকে ৬টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি গ্রামীণ হাসপাতাল আর একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। এই পরিকাঠামো কি একটি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার পক্ষে যথেষ্ট? ভারত-ভুটান সীমান্ত শহর ও তার আশপাশ এলাকায় প্রায় দু'লক্ষ মানুষের বসবাস। আলিপুরদুয়ার ১ ও ২ নম্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কামাখ্যাগুড়ি, লতাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ফালাকাটা ও ভাটিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলির যে পরিকাঠামো, তার উপর জটিল বা কঠিন কোনও রোগের জন্য আস্থা রাখতে পারেন না মানুষ। নতুন জেলা হলেও এখনও ৭০-৮০ কিমি দূর থেকে চিকিৎসার প্রয়োজনে ছুটে আসতে হয় জেলা সদরে। তারপর জেলা সদর থেকেও যখন রোগীকে রেফার করা হয় অন্যত্র, তখন চূড়ান্ত সমস্যায় পড়ে যায় রোগীর আত্মীয়রা।

তবে আশার কথা, জেলার একমাত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি ফালাকাটা শহরে নির্মীয়মাণ। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, খুব দ্রুত সেই হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা শুরু হবে। দু'জন চিকিৎসক আপাতত রোগী দেখবেন। পরে ধীরে ধীরে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়বে। জেলা স্বাস্থ্যকর্তা পুরমকুমার শর্মা স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে জেলা হাসপাতাল। ৫২ জন চিকিৎসক রয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগে আরও চিকিৎসক প্রয়োজন। সে কথা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আশা করছি জুন-জুলাই মাসে আরও চিকিৎসক পাওয়া যাবে হাসপাতালে। মনে রাখতে হবে, বিষয়টি ডায়নামিক। কারণ চিকিৎসক যেমন আসছেন, তেমনি উচ্চশিক্ষার স্বার্থে অনেকেই চলে যাচ্ছেন। ফের তাঁদের শূন্যস্থান অন্য কেউ পূরণ করেন।

প্রায় ৪০ বছর আগে দাবি উঠেছিল আলিপুরদুয়ারকে জলপাইগুড়ি থেকে পৃথক করে নতুন জেলা করার। দাবি উঠেছিল প্রশাসনিক স্তরে সুবিধার স্বার্থে। পুলিশ ও বিচারবিভাগীয় কাজের গতি বৃদ্ধি করতে। কিন্তু জেলা গঠনের পর প্রায় দু'বছর হতে চলল অথচ আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালত এখনও জেলা আদালত স্তরে উন্নীত হল না। আগাম জামিন থেকে শুরু করে বহু বিষয়েই মানুষকে ছুটতে হয় জলপাইগুড়ি। উল্লেখ করতে হয়, কুমারগ্রাম ব্লক থেকে

দশরথ তিরকি
সাংসদ

কী করে পূর্ণাঙ্গ জেলা হয়ে উঠবে আলিপুরদুয়ার? মাত্র দু'বছরেরও কম সময়ে কি একটা বিরাট অনুন্নীত এলাকাকে পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত করা যায়? তবে যিনি আলিপুরদুয়ারক জেলার স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁর পথ ধরে উন্নয়নের যত কাজ শুরু হয়েছে তা অর্ধেকের বেশি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। যারা মহকুমা আদালত, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়— এসব কথা বলছেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, দু'-তিন বছর আগে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে একটু ভিতরে অঞ্চলগুলির কী চেহারা ছিল। আজ তাঁরা গিয়ে দেখুন সেইসব এলাকার রাস্তাঘাট, মানুষজনের চেহারা কেমন বদলে গিয়েছে। মহকুমা হাসপাতাল যেমন জেলা হাসপাতাল হয়েছে, মহকুমা আদালতও জেলা আদালত হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ও হবে। ধৈর্য ধরুন, আলিপুরদুয়ার জেলা উন্নয়নের পথেই এগচ্ছে। আগামী দিনে এই জেলা নিয়ে কারও কোনও প্রশ্ন থাকবে না।

সৌরভ চক্রবর্তী
বিধায়ক, আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ারবাসীর দীর্ঘ দিনের জেলার দাবি ছিল। তাকে আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলাম আমরা। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই দাবি এবং আন্দোলনকে মান্যতা দিয়েছিলেন। যাঁরা আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা ভুলে যান, একটি জেলার বয়স মাত্র দু'বছর। তবু এ জেলার গায়ে এখনই লেগে গিয়েছে উন্নয়নের স্পর্শ। যেখানে কোনও দিন পাকা রাস্তা, ড্রেন ছিল না, আজ সেইসব প্রত্যন্ত এলাকায় পাকা রাস্তা ও ড্রেন হয়ে গিয়েছে। যোগাযোগব্যবস্থা উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। শুধু এ রাজ্যের নয়, এ দেশের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে আলিপুরদুয়ার জেলা। পানীয় জল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে। মাত্র চার-পাঁচ বছর আগেও যেসব উন্নতির ছবি স্বপ্নেও ভাবা যেত না, আজ জেলাবাসীরা সেইসব সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করছেন। আগামী দিনে আলিপুরদুয়ার দেশের সেরা পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠবে। অগণিত বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে সেই শিল্পে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ও হবে।

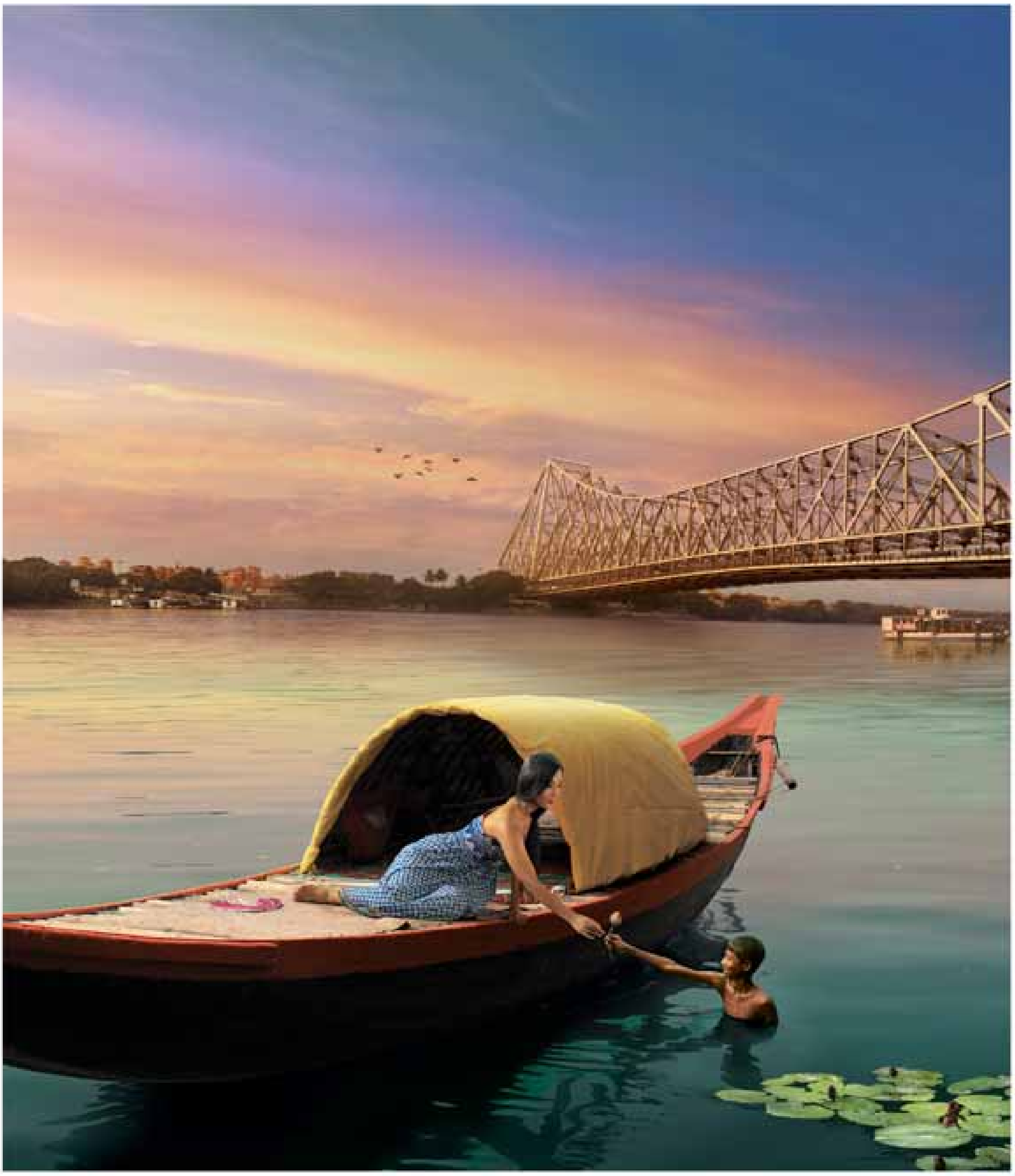

বহমান নদী, আবহমান শহর (হুগলী)

এ শহরের ঐতিহ্যের স্বাদ নিতে গা ভাসান গঙ্গার বুকে। ঢেউয়ের ভাষায় কান পেতে আবিষ্কার করুন হুগলীর ইতিকথা। আর সন্ধে নামলে যেই লণ্ঠন জ্বালাবে নৌকাগুলো, ঝলমলে শহরকে দু'পাশে ফেলে পৌঁছে যান তারাদের কাছাকাছি। অসীমের ঠিকানায়।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA

DEPARTMENT OF TOURISM,
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

মনোজ টিগ্গা
বিধায়ক, মাদারিহাট

আলিপুরদুয়ারবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবিকে মুখ্যমন্ত্রী যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার জন্য তাকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতেই হবে। কিন্তু একটা এলাকাকে জেলা বলা মানে শুধু কতকগুলো সাইনবোর্ডে জেলা কথাটির ব্যবহার কি? যদি তা-ই ধরা যায়, তবু বলতে হবে, আলিপুরদুয়ার মহমকুমা আদালতের সাইনবোর্ড এখনও বদল করা সম্ভব হয়নি। আইন-আদালতের বিষয় ছাড়াও জেলার আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারেও যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো থাকা দরকার, তারও কি কিছুর পূরণ হয়েছে? মহকুমা হাসপাতাল জেলা হাসপাতাল হয়েছে ঠিকই। সেখানকার স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা পরিকাঠামোর অবস্থাটাই বা কী? গত ৪-৫ বছরে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কতগুলো নতুন স্কুল তৈরি হয়েছে? যতগুলো স্কুল-কলেজ আছে, সেখানে কি উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন? জেলায় নতুন কলেজ কিংবা কারিগরি শিক্ষার কোনও বিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয় কি আছে?

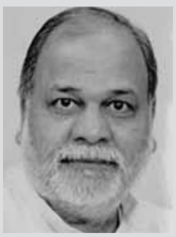

দেবপ্রসাদ রায়
প্রাক্তন বিধায়ক, আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার জেলা হয়েছে, তাতে আলিপুরদুয়ারবাসীর প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে— এই ঘটনার অন্যতম কারণ হল শাসকদলের অভাবনীয় সাফল্য। ইতিমধ্যে অনেকেই আলিপুরদুয়ার কত দূর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ জেলা, সে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বয়সের নিরিখে পূর্ণাঙ্গ জেলা আশা করা, তা তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাত্র দু'বছরে সমস্ত স্তরে উন্নয়নের একটা প্রলেপ দেওয়া যায় মাত্র। সেটাই বা কম কি? বহুদিন তো সেটাও ছিল না। নাগরিক সমাজ সেই পরিষেবাটুকুও তো পেলেন। এ কথা ঠিক, বহু কাজ হয়েছে, হচ্ছেও। আগামী দিনেও উন্নয়নের জন্য যেসব প্রকল্প-পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়িত হবে। পর্যটনের ক্ষেত্রেও অন্যতম হয়ে উঠবে আলিপুরদুয়ার। সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তবে উন্নয়নের কাজে বিশেষ করে লক্ষ রাখতে হবে, এই জেলার জীববৈচিত্র এবং জনবৈচিত্র্য, যা আলিপুরদুয়ারের অন্যতম সম্পদ, তা যেন কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়। দু'বছর বয়সি আলিপুরদুয়ার জেলার যেসব ঘাটতি রয়েছে তা অন্যান্য জেলার মতোই। তাকে খুব একটা বড় করে না দেখে বয়সের নিরিখে তার উন্নয়নমুখী কাজকর্মগুলো দেখলেই অপেক্ষাকৃত ভাল হয়।

জলপাইগুড়ির দূরত্ব কমবেশি ১৫০-১৭০ কিমি। দিনে গিয়ে আদালতের কাজ সেরে ওই দিনই ফিরতে পারেন না কুমারগ্রামের মানুষ। তবে আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি জহর মজুমদার, সম্পাদক সুহৃদ মজুমদারের আশা, খুব দ্রুত জেলা জজের আদালত বসতে চলেছে। কারণ প্রাথমিক কিছু পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের জোনাল জজ হরিশ ট্যান্ডনও বর্তমান মহকুমা আদালতের পরিকাঠামো পরিদর্শন করে গিয়েছেন। জেলা গঠন হবার সঙ্গে সঙ্গে জেলাশাসক নিয়োগ হয়েছিল।

তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে, অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদায় আরও দু'জন আধিকারিক প্রয়োজন। এডিএম জেনারেল, জেলা পরিষদ, ভূমি থাকলেও এডিএম উন্নয়ন পদে রয়েছেন অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে একজন এডিএম। কৃষি, পিএইচই, সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা কার্যালয় তৈরি হয়নি এখনও। গুরুত্বপূর্ণ বহু সরকারি দপ্তরের অফিস পর্যন্ত তৈরি হয়নি এখনও। জলপাইগুড়ি থেকে এখনও মহকুমা অফিসগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে অথবা একজন আধিকারিককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে নতুন জেলার কাজ চালানো হচ্ছে। সরকারি কর্মচারী সংগঠনের একটি অংশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা স্পষ্ট জানালেন, নতুন জেলা গঠিত হলেও এখনও সব জেলা দপ্তর তৈরি হয়নি। অধিকাংশ অফিসে কর্মী প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো নেই কোনও জেলা দপ্তরেরই।

আলিপুরদুয়ার জেলার মর্যাদা পেলেও পূর্ণাঙ্গ থানার সংখ্যা আটটি। আগেও তা-ই ছিল। জেলা হওয়ার পর থেকে আরও চারটি থানার দাবি থাকলেও নতুন কোনও থানা আত্মপ্রকাশ করেনি। কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা ও আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া শালকুমার হাটে দু'টি থানার দাবি জোরদার হয়ে উঠলেও সাড়া মেলেনি। জেলা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সুপার পেয়েছিল জেলাবাসী। মাস ছয়েক আগে নতুন একজন মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের পদ তৈরি করে জয়গাঁতে একটি মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিস তৈরি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও পুলিশ লাইন তৈরি হয়নি। জেলায় অন্তত ছ'জন ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক থাকবার কথা। এখন পর্যন্ত সেই পদ তৈরি হয়নি, মাত্র দু'জন এসডিপিও জেলাতে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সাধারণ পুলিশকর্মী এবং অফিসার রয়েছে। এত বড় একটি জেলার আইনশৃঙ্খলার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আরও পুলিশকর্মী ও অফিসার দরকার। নতুন জেলায় পুলিশ পরিকাঠামো আরও উন্নত ও আধুনিক হওয়ারও দাবি রাখে। কারণ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান ও নিম্ন আসামের জঙ্গি কবলিত পোখরাঝাড় জেলার সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের সীমানা নির্ধারিত।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, জেলা হিসেবে গড়ে উঠতে হলে আরও অনেকটা পথ যেতে হবে আলিপুরদুয়ারকে। কারণ, এখনও মানুষকে বিচার পেতে জলপাইগুড়ি ছুটতে হয়। সমস্ত সরকারি দপ্তর এখনও পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে, ২৫ জুন জেলার দ্বিতীয় জন্মদিনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন জেলা সদরে। দু'বছরে পদার্পণ করে পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে কোন কাজ কতটা হল তা নিয়ে হয়ত চলবে চুলচেরা বিশ্লেষণ। তবে একটি বড় অংশর মানুষ কিন্তু এখনও মনে করছেন, সত্যিকারের জেলা হিসেবে পথ-চলা শুরু করতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে। কারণ স্বাস্থ্য, প্রশাসন বাদ দিলেও থেকে যায় শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এখনও পর্যন্ত কোনও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ক্যাম্পাস অথবা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরির কোনও পরিকল্পনা হয়নি। উচ্চশিক্ষা পেতে হলে এখনও কিন্তু জেলাবাসীর মূল ভরসা কলকাতা কিংবা শিলিগুড়ি। গোটা জেলায় কলেজের সংখ্যা সাতটি। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ারে তিনটি, কুমারগ্রাম, বীরপাড়া, ফালাকাটা ও জয়গাঁতে একটি করে। এগুলি সবই ২০১১-র আগে। পরবর্তীকালে একটি কলেজেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়নি। নতুন কোনও প্রাথমিক অথবা উচ্চবিদ্যালয়ও তৈরি হয়নি গত পাঁচ বছরে।

অম্লানজ্যোতি ঘোষ

বই পত্রের ডুয়ার্স

দুই কবি

তপেশ দাশগুপ্তর 'হেঁটে' এবং অমিত দে-র 'নাম দিতে নেই' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশক 'এখন বাংলা কবিতার কাগজ'। অমিত নবীন কবি। 'নাম দিতে নেই' তাঁর প্রথম কবিতার

বই। প্রথম বই সাহিত্যজীবনের স্মরণীয় ঘটনা। চতুর্থ মলাটের লেখা থেকে জানা গেল, তিনি মফস্‌সল নিবাসী এবং গ্রামীণ জীবনের কাছাকাছি থাকেন। কবিতায় অবশ্য সেই জীবনের প্রতিফলন আবছাভাবে আছে। মূলত নিজের মনের অতলে ঘনিয়ে ওঠা কথাগুলিই ধরে রেখেছেন তিনি। নিচু স্বরে সেসব ব্যক্ত করেছেন ছাপার অক্ষরে।

অমিতের কবিতায় আরোপিত জটিলতা কিংবা শব্দমোহের মত্ততা কম। আদ্যন্ত রোমান্টিক চোখে, কিছুটা বিষাদজনিত উদাসীনতায় লেখা কবিতাগুলি যে অসাধারণ সৃষ্টি— এ কথা বলব না। কিন্তু বাড়িয়ে লেখার দোষ থেকে অনেকটাই মুক্ত থেকেছেন বলে এক ধরনের ভাললাগা অনুভূত হবে। কোনও কোনও অনুভব বেশ গভীরতা দাবি করে। যেমন 'সত্যি কথা বলিনি এতদিন/ তোমার নিশ্চিত বিনিময়ে/ কেমন অনিশ্চিত লেগে থাকে'। 'হাটবার', 'মরমী কথা' প্রভৃতি কবিতায় প্রমাণিত হয়, অমিতের দেখার চোখটাও ভাল। নামকবিতায় একটা জানালার প্রসঙ্গ এসেছে, এবং প্রচ্ছদে সেটাই ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পী অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটির ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

তপেশ দাশগুপ্তর 'হেঁটে' অবশ্য কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় আর ভাবনা থেকে কবিতা বার করে এনেছেন তপেশ, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়। ১২০ পাতার বইটিতে দু'শোর বেশি কবিতা আছে, কারণ তপেশের প্রায়

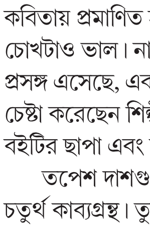

সব কবিতাই মাত্র কয়েক লাইনের। দু'-তিন লাইনের কবিতার সংখ্যাও মন্দ নয়। অনুমান করি যে চলতে-ফিরতে, ঘর-গেরস্তালিতে নিত্য ঘটে যাওয়া সাধারণ বিষয় আর ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করে তাঁর যা মনে হয়, সেটাই লিখে ফেলেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। বেশ কিছু কবিতা নিঃসন্দেহে তৃপ্তিদায়ক। যেমন 'লাইন পেরোলে নির্জন গাছটিকে/ আর একা পাই না/ সেখানে তুমি বাড়ি বানিয়েছ'। কিংবা 'তুমি কি ভাবে শোও/ আমি কি ভাবে শুই/ ঘুমের মধ্যে আমরা হারিয়ে যাই দুইখানে'। কবিতাগ্রহী পাঠকরা বইটি পড়লে এইরকম বেশ কিছু নমুনা পাবেন, এবং অনুমান, যে তাঁরা খুশিই হবেন। বইটির ছাপা সুন্দর এবং বাঁধাই ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রচ্ছদ বর্ণময় এবং বইটিতে কবির ছবি আর পরিচিতিমূলক গদ্য নেই। এটা ভাল লাগল। কবি রহস্যময় থাকলেন।

'নাম দিতে নেই'। অমিত দে। এখন বাংলা কবিতার কাগজ। জলপাইগুড়ি। ৪০ টাকা
'হেঁটে'। তপেশ দাশগুপ্ত। এখন বাংলা কবিতার কাগজ । জলপাইগুড়ি। ৬০ টাকা।

অন্যরকম ছড়া

দেবাশিস কুণ্ডু কবিতা ও ছড়া— দু'টি জগতেই বিচরণ করেন। তাঁর 'কট্টরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের Zone Know' (এভাবেই নামটি লেখা) অবশ্য ছড়ার বই। দেবাশিসের ছন্দোবোধ এবং অন্ত্যমিল গঠনের ক্ষমতা

বেশ পোক্ত। ছড়া লেখার ধরনটিও সুন্দর। গড়পড়তা ভাল ছড়ার তুলনায় যে একটু আলাদা, তা বলতেই হচ্ছে। অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে নিটোল ধ্বনিসাম্য গঠনের বদলে ধ্বনিসাম্যের আভাস দেওয়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে। যেমন 'কালকের শত্রুতা আজকের সখ্য/ দুনিয়াদারিতে দেখি রক্ষকই ভক্ষ্য'। এটা সব সময় যে মোক্ষম হয়েছে তা নয়। যেমন 'চোনা লাগে ওনাদের, বাবারটা ষণ্ড/ ষাঁড়ের পেচ্ছাপে ভাই— ফোঁটা দেওয়া সম্ভব?' এখানে ছন্দেরও কিঞ্চিৎ ঢিলে ভাব কানে আসে। 'পেচ্ছাপে' শব্দের দ্রুত উচ্চারণে সে ঢিলে ভাব দূর করতে হয়।

৪২ পাতার এই ছোট বইটি অবশ্য এক কথায় উপভোগ্য। সামাজিক অসংগতি থেকেই তাঁর অধিকাংশ ছড়ার জন্ম। কোনও একটা বিষয় বলতে গিয়ে অন্ত্যমিল-মধ্যমিলের খেলায় মেতে এক ধরনের ছেলে ভুলানো ছড়ার আমেজ নিয়ে আসেন মাঝে মাঝেই। 'দুষ্কৃতীর ডায়েরি থেকে' নামের একাধিক ছড়া আছে। এগুলো বেশ ভাল লেখা। 'সরি মহম্মদ' ছড়ার আড়ালে একটি চমৎকার কবিতা বলেই মনে হল। এটাই বইয়ের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ লেখা। কয়েকটি সুন্দর লিমেরিক পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে আর দশটা ছড়ার বই থেকে এটা অনেকটাই আলাদা। কেবল প্রচ্ছদটি উপযুক্ত হয়নি। চতুর্থ মলাটে লেখকের ছবির নিচে যা লেখা আছে তা অভিনব। ছড়াপ্রেমীরা বইটি সংগ্রহে রাখতেই পারেন।

'কট্টরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের Zone Know'। দেবাশিস কুণ্ডু। স্বপ্রকাশ। জলপাইগুড়ি। ৫০ টাকা।

মধ্যবর্তী পত্রিকা

বিশ্বরূপ দে সরকারের সম্পাদনায় বালুরঘাট থেকে 'মধ্যবর্তী' প্রকাশিত হচ্ছে ২৭ বছর ধরে। বর্তমানে পত্রিকাটি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মে ২০১৬ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে 'হাংরি'খ্যাত মলয় রায়চৌধুরির অবশ্যপাঠ্য একটি রচনা, যা হাংরি

আন্দোলনের বেশ কিছু গুপ্ত সংবাদ সমন্বিত। উক্ত আন্দোলন নিয়ে উৎসাহী পাঠক এই রচনাটি থেকে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সন্দেশ লাভ করবেন। এ ছাড়াও কতিপয় লেখকের ব্যক্তিগত গদ্যে বাংলা গদ্যের বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে এসেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন দেবায়ন চৌধুরি। একালের সাতজন মার্কিন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন অঙ্কুর সাহা। 'মধ্যবর্তী' সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। এই সংখ্যায় তিনটি গল্প এবং বেশ কিছু কবিতা ছাপা হয়েছে। গল্পগুলি সুলিখিত। ঝুমা চট্টোপাধ্যায়ের গল্পটি বেশ। বাকি দু'টির লেখক অনুপম মুখোপাধ্যায় ও আদিদেব মুখোপাধ্যায়। দু'টি অণুগল্প স্থান পেয়েছে পাশাপাশি। লিখেছেন ব্রতী মুখোপাধ্যায় ও সুদীপ সেন। ইন্দ্রজিৎ দত্তর কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন অমিতাভ মৈত্র। একটি ধারাবাহিক উপন্যাস রয়েছে, যার লেখক সন্মাত্রানন্দ।

বালুরঘাট থেকে প্রতি মাসে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ কর্ম নয়। সম্পাদক একটি কঠিন কর্মে ব্রতী হয়েছেন এবং তার ফলও লাভ করতে শুরু করেছেন। সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে 'মধ্যবর্তী' বেশ পরিচিত কাগজ। ছাপা আর সম্পাদনা সুন্দর। সঞ্জয় আর্টিস্ট-এর প্রচ্ছদটি মন্দ হয়নি। পত্রিকাটির দপ্তর বালুরঘাটে, কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে ব্রহ্মপুর, কলকাতা থেকে।

'মধ্যবর্তী'। মে'১৬। সম্পাদক বিশ্বরূপ দে সরকার। বালুরঘাট। ২০ টাকা

রজত অধিকারী

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

কমপ্যাক্টর গাড়ি পাওয়া গিয়েছে

৮ নং ওয়ার্ডে হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে

মাথাভাঙা পৌরসভার নতুন কিছু প্রকল্প

মাথাভাঙা মাছবাজারের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায়। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

হাইড্রেন প্রকল্পে ৮ নং ওয়ার্ডে শিবশংকর সা-এর বাড়ি (মনমোহন পাড়া) থেকে শুরু হয়ে কেষ্ট সাহার বাড়ি পর্যন্ত ২৬৫ মিটার লম্বা (চওড়া ৪ মিটার) হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে পূর্ণ গতিতে। খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা।

রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য কমপ্যাক্টর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক আরও জানিয়েছেন—

শহরের নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারে রাজ্য সরকারের তরফে দেড় কোটি টাকার অনুদানে নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার চলছে।

আশুতোষ হলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। কাজ চলছে।

চন্দন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান

এছাড়া ঐতিহ্যমণ্ডিত মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি গ্রন্থাগার ও শিবমন্দিরের সংস্কারের কাজ শেষ।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা—

নদীর জল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে।

বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ হবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।

চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের টেন্ডার সম্পন্ন।

মালিবাগানে পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কলেজ মোড়ে দুটি অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।

বিগত বোর্ডের কারণে এই পৌরসভার দায়ে থাকা প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা মেটাতে তিনটি নতুন পাম্প চালু করার চেষ্টা চলছে।

দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নে ভেঙে পড়া পৌর-ব্যবস্থাকে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে মাথাভাঙা পৌরসভা।

শহরে কনফারেন্স হল ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নগরবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে এই প্রথম একজন স্থায়ী চিকিৎসক ডা. অভিজিৎ সিনহাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও একজন স্যানিটারি ইনস্‌পেক্টর এবং একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পে ৬৩টি পাকা ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া 'আরবান পুওর' প্রকল্পে ২৪টি ঘর নির্মাণ করে প্রাপকদের প্রদান করা হবে প্রাথমিক পর্যায়ে। খরচ ২.৮৭কোটি টাকা।

লক্ষপতি প্রামাণিক, চেয়ারম্যান

মাথাভাঙা পৌরসভা

উত্তরের রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ শুরু

সব এলোমেলো করে দিলেন নেত্রী। লোকে বলছে, শিলিগুড়ির মৌরসিপাট্টা শেষ। ক্ষমতার কেন্দ্র এখন কোচবিহারে। গৌতমপন্থীরা স্বভাবতই বিমর্ষ, আর গৌতম-বিরোধীরাও ঘাবড়ে বলছে, যাব্বাবা, এতটা ভাবিনি! তবে ধান্দাবাজরা একই রকম সক্রিয়, তাদের কথাই আলাদা। কিন্তু আসল কথা হল, উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ পালটে গেল। গত পাঁচ বছর যা দেখে এসেছে মানুষ, এবার দেখবে অন্যরকম ছবি। এবারের প্রতিবেদনে তারই প্রথম ঝলক।

গৌতম এখন রাজ্যহীন রাজা!

একটা কথা চালু আছে— হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী ঠিকানা থাকলেও এটি চলমান। কারণ হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা যেখানেই যান, তাঁদের সঙ্গে মহামান্য আদলত চলে। অর্থাৎ বিচারপতিরা যেখানে যান, প্রয়োজন মনে করলে সেখানেই বিচারসভা বসিয়ে বিচার করতে পারেন। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি প্রয়াত আনন্দ ভট্টাচার্য সস্ত্রীক রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লিতে যাবার জন্য হাওড়ায় ট্রেনে উঠে দেখেন, তাঁর স্ত্রীর জন্য রিজার্ভ করা আসন রেল কর্তৃপক্ষ ভুল করে অন্য একটি মেয়ের নাম সংরক্ষিত করে টিকিট দেওয়াতে সে সেই আসনে বসে আছে। বিচারপতি ভট্টাচার্য হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই বিচারসভা বসিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্দেশ জারি করেছিলেন, রেল কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর নাম সংরক্ষিত আসন থেকে ওই মেয়েটিকে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে আসন দিতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়তে পারবে না।

বিচারপতি প্ল্যাটফর্মে বসে রায় দিলেও তাকে মান্যতা দিতে হবে, তা না হলে আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে। অথচ সেই কিশোরী যাত্রীটিকে রেল কর্তৃপক্ষ ভুল করে হলেও বৈধ সংরক্ষণের টিকিট দিয়েছে। সে দিন রাজধানী এক্সপ্রেসে একটি আসনও খালি ছিল না। এক মহিলা যাত্রী ওই কিশোরী যাত্রীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বার্থ ভাগাভাগি করে শুতে রাজি করিয়ে সে যাত্রায় রেল কর্তৃপক্ষকে আদালত অবমাননার দায় থেকে মুক্ত করেছিলেন।

রাজা যেখানে থাকেন, সেটাই হয় রাজ্যের রাজধানী। এতদিন উত্তরবঙ্গের রাজা ছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব। তাঁর বাসস্থান শিলিগুড়ি। তাই উত্তরবঙ্গের শক্তির ভরকেন্দ্র ছিল শিলিগুড়ি।

এবার রাজা বদলেছে। গৌতম দেবের রাজদরবারেও ঘটেছে পরিবর্তন। তিনি এখন উত্তরবঙ্গের রাজদণ্ডের অধিকারী নন। তাঁর হাতে গড়া

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সিংহদরজা দিয়ে সিংহাসনে বসেছেন বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর বাসভূমি কোচবিহার শহর। তিনি ঘোষণা করেছেন, উত্তরববঙ্গের উন্নয়ন দপ্তরের একটি প্রশাসনিক ভবন

কোচবিহারে স্থাপন করবেন, এবং সপ্তাহে তিন দিন করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সুরম্য ভবন 'উত্তরকন্যা'য় বসবেন।

বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর এই ঘোষণার মধ্যে একটা মানসিক প্রভুত্ববাদের ছায়া কাজ করছে। কলকাতার এক সময়ের লালবাড়ি এবং এখনকার 'নবান্ন' যেমন ক্ষমতার প্রতীক বলে চিহ্নিত, তেমনই উত্তরবাংলার অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়িতে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত উত্তরকন্যা ভবন উত্তরবাংলার 'রাজা'র ক্ষমতার প্রতীক। রাজার ভবন নির্মাণের যে বিশাল আয়োজন তা তো শুধু রাজার থাকার জন্য নয়, তার জন্য কয়েকটি ঘরই যথেষ্ট। এমনকি প্রশাসনিক কাজের জন্য বিশাল জায়গা জুড়ে অমন বিশাল ভবন নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে ক্ষমতার দাম্ভিকতা। শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোডের উপর অবস্থিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশাল ভবনটি অধিকাংশ সময়ই অলসভাবে পড়ে থাকে। বহু কোটির সেই কল্পিত স্বপ্নমোহর পরিচয়লিপিটি হারাবার দুঃখ নিশ্চয়ই তিনি অনুভব করছেন।

মানুষের শরীরসহ প্রতিটি বস্তুর থাকে একটি ভরকেন্দ্র। ওই ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন ঘটলে মানুষের শরীরের ভারসাম্যের পরিবর্তন হওয়ায় পতন ঘটতে পারে, তেমনই এই ভরকেন্দ্র অর্থাৎ 'সেন্টার অব গ্র্যাভিটি'র পরিবর্তন ঘটলে বস্তুর অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক অবস্থারও আছে ভরকেন্দ্র। এক সময় আদর্শবোধ এই ভরকেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করত। এখন এই ভরকেন্দ্রকে আবর্তিত করে চলে রাজনীতির শক্তির প্রসাদভোগী সুবিধাবাদীর দল।

উত্তরবঙ্গ যে দক্ষিণবঙ্গের ক্ষমতার প্রধান দপ্তরের উপগ্রহ— এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। রাজ্যের মোট আয়তনের প্রায় ২১ শতাংশ আয়তনের ভূখণ্ডের জন্য কি পূর্বের সরকার বা বর্তমান সরকার কোনও বৃহৎ পরিকল্পনা নেয়নি? তৃণমূল সরকারই

> উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে গৌতম দেব কিন্তু তাঁর অদম্য উদ্যোগে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। শহরের রাস্তাঘাট তো বটেই, গ্রামাঞ্চলের প্রান্ত জায়গাগুলিকেও আধুনিক রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি ঘটিয়েছেন, যা সেখানকার মানুষের কাছে ছিল স্বপ্ন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নিকটতম শহরের মধ্যে যাতায়াত ছিল সাহারা মরুভূমিতে উটের পিঠে অতিক্রম করার থেকেও ভয়ংকর।

'উত্তরকন্যা'র এই দাম্ভিক নির্মাণের কোনও প্রয়োজন ছিল কি?

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সপ্তাহে তিন দিন উত্তরকন্যায় বসার ঘোষণা প্রথম প্রথম অবশ্যই বজায় থাকবে। তবে ঘোষণার মধ্যে একটা অঘোষিত ঘোষণাও কিন্তু ঘোষিত হয়েছে এবার— উত্তরবঙ্গের রাজ্যপাটের মনসবদারির মুকুট গৌতম দেবের মাথা থেকে অপসৃত হয়ে শোভিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মাথায়। তাই রাতারাতি পাঁচ বছর ধরে শোভিত গৌতম দেবের নেমপ্লেট নামিয়ে দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা হল নতুন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেমপ্লেটে। এতদিন যে ভবনটিতে রাজা গৌতম দেব রাজোচিত পদক্ষেপে প্রবেশ করতেন, সেখানে তাঁকে আসতে হবে সম্মাননীয় হলেও অতিথি হিসাবে। গৌতব দেব রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী হিসাবে লাল বাতির গাড়িসহ নিরাপত্তারক্ষী পরিবৃত হয়ে চলার সম্মান পাবেন ঠিকই, তবে 'উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী'র প্রথম উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর গঠন করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী পরিষদের মর্যাদা দেয়। প্রথম উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে গৌতম দেব কিন্তু তাঁর অদম্য উদ্যোগে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। শহরের রাস্তাঘাট তো বটেই, গ্রামাঞ্চলের প্রান্ত জায়গাগুলিরও আধুনিক রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, বৈদ্যুতিন সংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি ঘটিয়েছেন, যা সেখানকার মানুষের কাছে ছিল স্বপ্ন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নিকটতম শহরের মধ্যে যাতায়াত ছিল সাহারা মরুভূমিতে উটের পিঠে অতিক্রম করার থেকেও ভয়ংকর। আজ সেই রাস্তা শুধু মসৃণ নয়, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে বিকল্প দ্বিতীয় রাস্তাটিও মসৃণতায় যে কোনও আধুনিক রাস্তার সঙ্গে তুলনীয়।

শিলিগুড়ি-বালুরঘাটের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলেও এখনও বহু যাত্রী বাসেই এই দীর্ঘ পথ যাতায়াত পছন্দ করেন। কারণ এই রাস্তা এখন এমন উন্নত হয়েছে যে, আগের দুঃস্বপ্নের সেই বাসযাত্রার অভিজ্ঞতা অতীত। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়েই গৌতম দেবের কর্মতৎপরতা ছিল প্রশংসনীয়।

প্রত্যেক সচল মুদ্রার হেড এবং টেল থাকে। বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা 'শোলে'র চিত্রনাট্যে শুধু 'হেড' মুদ্রার ব্যবহার করে অবশ্য দর্শকদের কাছে চমক দিতে পারলেও বাস্তবে তো তা অচল আধুলি বলেই চিহ্নিত হয়।

গৌতমবাবু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসাবে অতি অবশ্যই অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন— এতে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু তাঁকে ঘিরে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী স্তাবকের দল যে তাঁকে স্তাবকতার মোহিনী জালে আবদ্ধ করে তাঁর বহু শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে পৃথক করে দিচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতাকেও বন্দি করে চলেছিল। তাঁকে কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এর বিপদ বোঝাতে গেলে, তাদের অনেকেই অপমানিত হয়ে ফিরে এসে সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে। ফলে একদিন যারা নিজেদের নিঃস্বার্থ ভাবনায় সেই পরিবর্তনের জোয়ারে গৌতমবাবু তথা তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছিল, তারা ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছিল। তার বিরোধিতা না করলেও গৌতমবাবু মনে মনে গভীর ব্যথা অনুভব করেছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, এইসব মানুষের সেই সমর্থনের স্রোতের জোয়ারেই অশোক ভট্টাচার্যর মতো ভারী বাম-মন্ত্রীও শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভেসে গিয়েছিলেন।

শক্তির ভরকেন্দ্রর পরিবর্তনের সঙ্গে স্তাবকরাও যে শিবির পরিবর্তন ঘটায় তা কোনও নতুন ঘটনা নয়। আর সেটাই বোঝা গেল এনজেপি স্টেশনে কোচবিহারের বাসিন্দা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সদ্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে। শিলিগুড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকার সেই পরিচিত মুখগুলোর উপস্থিতি এবং মন্ত্রীকে সংবর্ধনাদানের উচ্ছ্বাস দেখে। এদেরই কিন্তু কিছুদিন আগেও তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেবকে ঘিরে থাকতে দেখা যেত।

গৌতম দেবের মন্ত্রিত্বকালে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থও খরচ হয়েছে। এখানেই গড়ে উঠেছে এক শ্রেণির কনট্রাক্টর— বালি, পাথর, সিমেন্টের সিন্ডিকেট, উন্নয়নের রাস্তাঘাট নির্মাণের পরিকল্পনা আগে থেকে জেনে নিয়ে স্বল্প দামে জমি ক্রয় করে এক শ্রেণির জমি হাঙরের দল। এরাই নানা স্তুতির জালে মন্ত্রীকে ঘিরে রেখেছিল। ফলে যারা সেই জালের বৃত্ত ভেদ করে তাঁর কাছে পৌঁছাতে

পারেনি, তারা নিজেদের বঞ্চিত মনে করে মনে মনে ক্রমশ তাঁর বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

যারা পেয়ে চলেছিল, তারা স্তাবকতার স্তুতিতে মন্ত্রীর আরও কাছে পৌঁছাতে শুরু হয়েছিল গোষ্ঠী লড়াই। এর উদাহরণ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে একই স্তাবক-তৃণমূল সিন্ডিকেটের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ।

গৌতম দেবের হাত থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রকের দায়িত্ব সরিয়ে দিয়ে তাঁকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পর্যটন দপ্তর নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। তবে এই দপ্তরের দায়িত্ব একজন পূর্ণমন্ত্রীর হাতে থাকলেও তা চলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য এই দপ্তরের বিশেষ কোনও অর্থ তহবিল বরাদ্দ যেমন হয় না, তেমনই সরাসরি কাজ করার জন্য অর্থ খরচ হয় না, যা উত্তরবঙ্গ দপ্তরের ছিল। তাই স্তাবকের সেই দল এখন দ্রুত নতুন ভরকেন্দ্রর দিকে ছোটার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

উত্তরবঙ্গের তথাকথিত মুখ্যমন্ত্রী গৌতম দেবের রাজত্বের সীমা কিন্তু ক্রমশ সংকুচিত হতে শুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। অথচ মন্ত্রী হিসেবে তাঁর মতো পরিশ্রমী কিন্তু খুব কম মন্ত্রীই ছিলেন। তিনি দার্জিলিং জেলার মানুষ। পাহাড় তাঁর রাজত্বের বাইরে প্রথম থেকেই চলে গিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সঙ্গে করে পাহাড়কে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও সফল হননি। সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল তাঁর নিজের জেলার সমতলভূমি, এমনকি নিজ বাসভূমি শিলিগুড়ি থেকে। তিনি উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজা। অথচ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন হারিয়ে তাঁর রাজত্বের সীমা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল শিলিগুড়ির কয়েকটি ওয়ার্ডের মধ্যে।

গৌতমবাবুর রাজনৈতিক উত্থান তাঁর নিজের, এমনকি উত্তরবঙ্গের অন্য জেলার অনেক তৃণমূল নেতাই মেনে নিতে পারছিলেন না। তৃণমূলের এই বিজয়স্রোতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত কাছের জন বাইচুং ভুটিয়ার পরাজয় মমতা সহ্য করতে পারেননি। তবু গৌতম দেবকে মন্ত্রীসভা থেকে যে বাদ দেননি, সেটা গৌতম দেব বলেই হয়ত। আগামী পাঁচ বছরের জন্য অন্ততপক্ষে গৌতমবাবুকে রাজত্বহীন রাজার ভূমিকায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ক্ষমতার কেন্দ্র মূলত কোচবিহার এবং কিছুটা দক্ষিণ দিনাজপুরে স্থানান্তরিত হয়ে গেল।

সৌমেন নাগ

ওজনদার পদ পেতে মরিয়া উদয়ন!

এখন দিনহাটা শহরে গিয়ে এদিক-ওদিক কান পাতলে টুকটাক নানা মন্তব্য ভেসে আসবে। যেমন, উদয়নের তৃণমূলে যোগদান নাকি বুড়ো বয়সে বিয়ে করার মতই ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত! কিংবা, কমল গুহ কি জীবদ্দশায় কোনও দিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, তাঁর সারাজীবন ব্যয় করে তৈরি করা সাজানো-গোছানো দলটির কফিনে পেরেক পুঁতবেন তাঁরই নিজের সন্তান! যে যা-ই বলুক, শকুন ও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন কমল-পুত্র উদয়ন। কিন্তু জিতেই তিনি বোধ করি উপলব্ধি করেছেন দু'টি কঠিন সত্য। এক, তৃণমূলের দুর্ভেদ্য সংগঠন তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদৃশ্য উপস্থিতিই জিতিয়েছে তাঁকে। আর দুই, তাঁকে জিতিয়ে এনে কোচবিহার থেকে ফব নামক দলটিকে মুছে ফেলতে পেরেছেন যিনি, সেই মমতা যদি তাঁকে এবার কোনও পদ না-ও দেন, তবে তাঁরও কিছু করার থাকবে না।

আর এই উপলব্ধিই তাঁর টনক নাড়িয়ে দিয়েছে মন্ত্রীসভার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর। 'পদ না পেলে লাথি-গুঁতোর যেমন অন্ত থাকবে না, তেমনই নির্বাচনে বিপুল ব্যয়েরও কোনও সদর্থক সুরাহা হবে না।'— দিনহাটারই এক ভারী তৃণমূল নেতার মন্তব্য অনেকটা এইরকমই। আর সেটা যে অনেকাংশেই সত্য তা নাকি বলা যায় উদয়নের সাম্প্রতিক গতিবিধি লক্ষ করলেই। তৃণমূল নেতার কথায়, সোজা রবি ঘোষের পায়ে ডাইভ দিয়েছেন উদয়ন, কারণ এই মুহূর্তে রবিদাই তাঁর মুশকিল আসান করতে পারেন। কিন্তু উদয়ন তো গোড়া থেকেই রবিবাবুর পথের কাঁটা, এখন কি উদয়নের গা ঘেঁষাঘেঁষিকে পাত্তা দেবেন তিনি? উত্তরে নেতার ব্যাখ্যা, পাত্তা দিলে রবিদার ক্ষতি নেই এখন। যা পাওয়ার নিজে তো পেয়েই গিয়েছেন। উদয়ন সঙ্গে থাকলে বরং জেলায় দলের বিরোধী নেতাদের সঙ্গে লড়াইয়ে খানিক বল পাবেন।

উদয়ন গুহকে নিয়ে তৃণমূলি ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা বিচার করার আগেই বলে দেওয়া যায়, দলে বা সরকারে খুব শিগগিরি ওজনদার একটি পদ না পেলে তাঁর মতো রাজনীতিকের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন। আর এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কৌশল পিতা কমল গুহ সম্ভবত তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি।

জেলার দখল কতটা রাখতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ?

উপরওয়ালা তাঁর গত পাঁচ বছরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবার। তাঁর মন্ত্রিত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠেনি। উত্তরের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা ঈর্ষায় ফেলে দিতে পারে খোদ কলকাতার অনেক বাঘা নেতাকেও। এতদিন যা মনে মনে চেয়ে এসেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশিই পেয়েছেন— এ কথা তিনি নিজেও অস্বীকার করতে পারবেন না। আর তার ফলে একেবারেই উলটে-পালটে গিয়েছে উত্তরের ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি। যে দায়িত্ব এতদিন সামলে এসেছেন, এবার তার পরিধি, গভীরতা, আয়তন— সবকিছুই অনেক অনেক বড়। নিস্তরঙ্গ পুকুর থেকে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ার মতোই অবস্থা। রাজধানী কলকাতার মিডিয়া ফোকাস এখন তাঁর উপর। রয়েছে গত পাঁচ বছরে তৈরি হওয়া 'সিস্টেম' এবং 'চক্র'। সবার উপরে রয়েছে পারফর্মেন্স রিভিউ ও নেতৃত্বের 'প্রয়োজনে ক্ষমাহীন' হওয়ার সদ্য নিদর্শন। আমলানির্ভর সরকারি দায়িত্ব চালাতে এর আগে তিনি হোঁচট খেয়েছেন— বিলক্ষণ বুঝেছেন, দলের সংগঠন চালানোর সঙ্গে তার পদ্ধতিগত মিল নেই। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগছে রাজনৈতিক মহলে এবং অনুগামীদের মনে— সদ্য আরোপিত গুরুদায়িত্ব সামলে সাংগঠনিক প্রতিপত্তি কতটা বজায় রাখতে

পারবেন কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ?

গোড়া থেকে শুরু করে গত ষোলো বছর ধরে জেলার অখণ্ড কর্তৃত্ব তৈরি করেছিলেন কৌশলে ও বাহুবলে। কিন্তু একে একে বাদ সাধতে শুরু করলেন মাথাভাঙার বিনয় এবং দিনহাটার উদয়ন। নবাগত অর্ঘ্য রায় প্রধান গোড়া থেকেই তাঁকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ন'টির মধ্যে পাঁচটিতেই তাঁর নিজের পছন্দের প্রার্থী ছিল না এবং সব ক'টিতেই জয় (দু'টি সবার অপ্রত্যাশিত) বলাই বাহুল্য জেলা জুড়ে তাঁর প্রতিপত্তিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন টেনে দেয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে তাঁকে যে আপাত রক্ষা করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর পদপ্রাপ্তি— এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্যি— যে সময় তিনি এতদিন সাংগঠনিক কাজে দিতে পারতেন, তার সিকি ভাগও কি এবার দিতে পারবেন! মন্ত্রিত্বের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ সামলে কোচবিহারে আদৌ কতটা সময় দিতে পারবেন, সেটাই প্রশ্ন।

আপাতদৃষ্টিতে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথকে জেলানেতৃত্ব থেকে সরাবার কথা ভাবা হচ্ছে না। সংগঠনে সময় দিতে হয়ত সহকারী বা কার্যকরী সভাপতি হিসেবে পছন্দের কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন তিনি। কিন্তু জেলা জুড়ে 'কর্তৃত্ব' ধরে রাখার ব্যাপারে তা আদৌ কতটা কার্যকরী হবে, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। রাজনীতিতে জেলায় তাঁর অনুগামী নেতা বা বিধায়ক হয়ত রয়েছে, কিন্তু নিজস্ব 'কর্নেল' হিসেবে এখনও কাউকেই তৈরি করে উঠতে পারেননি কিংবা হয়ত যোগ্য কাউকেই খুঁজে পাননি। সংগঠনের জন্য রবিবাবুর সময় যতই কমবে (যা অবশ্যম্ভাবী), ততই তাঁর নিজের অনুগামীদের মধ্যেই মাথাচাড়া দেবে উপগোষ্ঠীর। আর তাঁর গোষ্ঠীর বাইরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তা বলাই বাহুল্য। যারা কিছু পাবে, তারা চুপ থাকবে। কিন্তু যারা বঞ্চিত থাকবে, তারা নিষ্ক্রিয় থাকবে না। সব মিলিয়ে জেলার দখল আগের মতো ধরে রাখা যে কঠিন হবে তা নিঃসন্দেহে জানেন রবিবাবু নিজেও। গৌতম দেব যে ভুল করে আজ 'সাজা' ভোগ করছেন, সে ভুল নিশ্চয়ই করবেন না সদাসতর্ক রবীন্দ্রনাথ।

বখশিসে সন্তুষ্ট নয় আলিপুরদুয়ার

প্রথমে আশা ছিল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবার পাচ্ছেন তাদের বিধায়ক ঘরের ছেলে সৌরভ গুটিস চক্রবর্তী। অনুগামী বা সমর্থকদের মুখে মুখে শহর জুড়ে ঘুরে বেড়াত সে কথা। ফল বার হওয়ার পর স্থানীয় মিডিয়ার দাক্ষিণ্যে বদলে গেল সেই হাওয়া— এবার দিদি নাকি তাঁর প্রিয় ভাইকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে আলিপুরদুয়ার তথা রাজ্যের পর্যটন শিল্পের হালকে বদলে দিতে চান। উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকল। ডুয়ার্সের মানুষও ভাবতে শুরু করল, যাক, দীর্ঘ দিনের উপেক্ষিত জ্যোতিবাবুদের প্রমোদক্ষেত্র ডুয়ার্স বোধহয় এবার পর্যটনে নতুন রূপে হাজির হবে— কর্মসংস্থান হবে মানুষের, বাইরের রাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যাওয়া কমবে, বেআইনি পাচার ইত্যাদি অপরাধ জগৎ থেকে মুক্তির সুযোগ আসবে এবার। উত্তেজিত ছিলেন সৌরভ নিজেও। মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে ফের বসবার কথা ভাবতে শুরু করে দিলেন। কিন্তু সব উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়ে আলিপুরদুয়ারের মানুষকে হতাশ করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্ত্রীতালিকা প্রকাশ করলেন, তাতে নামই নেই সৌরভ চক্রবর্তীর। সত্যি কথা বলতে, এই হতাশা চেপে রাখতে পারেনি শহর আলিপুরদুয়ারের জনগণ। কর্মীদের মধ্যে দেখা গেল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। সৌরভের কমান্ডাররা, যাঁরা নির্বাচনের 'ব্যয়ভার' বহন করতে কোনও কার্পণ্য করেননি, তাঁরাও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কেউ কেউ একে 'না ইনসাফি' আখ্যা দিলেন, কেউ কেউ আলিপুরদুয়ারের মানুষের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগও আনলেন।

বিপাকে পড়লেন সৌরভও। কিছু একটা সত্বর হাতে না পেলে কর্মীদের যে ঠান্ডা করা দায় তা বুঝতে দেরি হয়নি তাঁর। শোনা যায়, দিদির ইচ্ছে ছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দায়িত্ব নাকি এবার অন্য কাউকে দেওয়ার, এবং তা নিয়ে সেই নেতার সঙ্গে দিদির কথাবার্তাও হয়। সৌরভকে অন্য কোনও দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেরকমই ভেবে রেখেছিলেন দলনেত্রী। কিন্তু সৌরভের আর দেরি করার উপায় ছিল না, কারণ এর পর কবে কী পাওয়া যাবে, তার অপেক্ষায় থাকা যায় না— তৃণমূলে ঢুকে এ কথা বিলক্ষণ টের পেয়েছেন তিনি। সম্ভবত তাই তাড়াহুড়ো করে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের জন্যই তদবির করলেন। কোথায় কতটা কলকাঠি নাড়তে পেরেছেন তা জানা নেই, কিন্তু দেখা গেল, রাতারাতি সিদ্ধান্তে পরদিন সকাল সকাল চেয়ারম্যান পদে আসীন হলেন তিনি। উত্তরবঙ্গের জনগণ এবং কলকাতার সংবাদমাধ্যম সে খবর জানতে পারল সে দিন সকালেই উত্তরবঙ্গের একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আলিপুরদুয়ারের মানুষ কিন্তু এতে খুশি হননি। অসন্তোষের ছাপ কর্মীদের কথাবার্তাতেও। তাদের কথা, আগেই যে 'ইনাম' দেওয়া হয়েছিল, জিতে বিধায়ক হয়েও সেই একই 'বখশিস' দিয়ে, উপরন্তু সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যানের ল্যাংগোট জুড়ে আর যা-ই হোক, আলিপুরদুয়ারের আদৌ কতটা উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব? প্রথমবার জিতেই ভাল দপ্তর পেয়ে গেলেন কুজুর অথচ আলিপুরদুয়ার জেলার উন্নয়নের প্রতীক হয়েও সৌরভকে কিছুই দেওয়া হল না— এই প্রশ্নই ঘুরে-ফিরে আসছে সবার মনে। সৌরভের বিরোধী গোষ্ঠী যে এতে বেশ খুশি তা-ও স্পষ্ট— তাদের বক্তব্য, আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে ভাল ফলের জন্য সৌরভের আলাদা কোনও কৃতিত্ব নেই এবং নেতৃত্ব সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সে যা-ই হোক, এখন হতাশ আলিপুরদুয়ারবাসীর একটাই আশা বেঁচে— আগামী ২৫ জুন জেলার দ্বিতীয় জন্মদিনে এসে দিদি যদি ভাইয়ের মুখ চেয়ে ভাল কিছু ঘোষণা করেন।

নিভৃতে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছেন যে ‘ব্যতিক্রমী’ বিধায়ক

মমতার মন্ত্রীসভা দ্বিতীয়বার শপথ নেবার দু'দিন আগের কথা। কলকাতায় হাজির সব নির্বাচিত বিধায়ক ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা। উত্তেজনায় কমবেশি টানটান সবাই— কার কপালে মন্ত্রিত্বের শিকে ছেঁড়ে। ব্যতিক্রমী সেই ভদ্রলোক তখন সেসব টানাপোড়েন থেকে বহু দূরে এমএলএ হস্টেলে নিজের কামরায় লুঙ্গি পরে বসে নিভৃতে ফোনে আলোচনা চালাচ্ছেন পূর্বপরিচিত ভূবিজ্ঞানীদের সঙ্গে। উদ্দেশ্য, তাঁর এলাকার শালটিয়া নদীর বর্ষায় ভাঙন রোধ ও শীতে শুকিয়ে যাওয়ার সমাধান খুঁজে বের করা। কারণ এতে উপকৃত হবেন তাঁর বিধানসভার বহু দরিদ্র চাষি। বললেন, এ সময় কাজটা এগিয়ে রাখি যতটা পারি। সেই ভূবিজ্ঞানীরা তাঁর অনুরোধে নদীর স্যাটেলাইট ছবি নিয়ে জায়গা পরিদর্শন করে এসেছেন ইতিমধ্যেই। নতুন বিধানসভা শুরু হতে না হতেই এর সমাধানসূত্রসহ প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করতে চান তিনি। তাই কাজ শুরু করে দিয়েছেন বিধায়ক হিসাবে শপথ নেওয়ার অনেক আগে থেকেই। তাঁর ইচ্ছে, বিধায়কের মাইনে যা পাবেন, তার পুরোটাই এই খাতে খরচা করবেন।

সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিটি হলেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক চৌষট্টি বছরের তরুণ মিহির গোস্বামী। ১৯৮৩ সালে কয়েকশো সিপিএম কর্মীর সশস্ত্র আক্রমণে প্রায় মৃত তাঁর রক্তাক্ত অচেতন দেহটি এক পুলিশ কনস্টেবল কাঁধে তুলে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর টানা তিন মাসের চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পান মিহিরবাবু। আজ শাসকদলের বিধায়ক হয়ে সেই সিপিএম-এর সন্ত্রস্ত কর্মীদের নিরাপদে ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করে ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমের কাছে ‘ব্রাত্য’ থেকে ‘ব্যতিক্রমী’ হয়ে উঠেছেন।

‘আসলে সেই ১৯৭১ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মিহিরবাবুকে বামপন্থীদের চাইতে অনেক বেশি লড়াই করতে হয়েছে নিজের দলের ভেতরেই, যারা তাঁর সততা ও নিষ্ঠাকে ভয় পায়, তাদের বিরুদ্ধে।’ এরকমই অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁর সমসাময়িক বামপন্থী নেতারা। ১৯৭৭ সাল থেকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আসছেন তিনি। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে কোচবিহারের বাম-দুর্গে কংগ্রেসের খাতা খোলেন তিনিই। ’১১ সালে টিকিট পেয়েও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন প্রতিশ্রুতিমতো আসন না দেওয়ায়। দলের মধ্যে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, অপমান, অবজ্ঞা ইত্যাদি জারি থাকলেও তিনি কখনও বিবাদে যাননি, স্বেচ্ছায় আড়াল বেছে নিয়েছিলেন।
এবার মমতা তাঁকে ডেকে দাঁড়ানোর কথা বললে তিনি সেটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন নিজেকে প্রমাণ করার। ফলস্বরূপ, কোচবিহার ১ নং ব্লকের যে ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিধানসভা কেন্দ্রে গত ৩৯ বছরে বাম-প্রার্থী কোনওবার হারেনি, সেখানকার মানুষ এবার তাঁকে জিতিয়েছেন প্রায় সাতাশ হাজার মার্জিনে। কিন্তু আক্ষেপ, যে শহরের মানুষ তাঁকে দলমত নির্বিশেষে পছন্দ করেন, সেই শহরে তাঁকে দলীয় অন্তর্ঘাতে পিছিয়ে যেতে হয়েছে প্রায় আট হাজার ভোটে।

‘ব্যতিক্রমী’ মিহিরবাবু তাই আপাতত ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর গ্রামীণ এলাকাগুলিতে— কৃতজ্ঞতা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দ্রুত চাহিদার তালিকা তৈরির কথা বলছেন। তাঁর বক্তব্য, কোচবিহার থেকে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েছেন, তাই আশা রাখা যায়, এবার এই প্রত্যন্ত অবহেলিত জেলাটির যথার্থ উন্নয়ন হবে। কোনও পদের আশা করেন না সত্যি? লাল বা নীল বাতি? উত্তরেও ব্যতিক্রমী রইলেন মিহির গোস্বামী, ‘নেতৃত্ব যে দিন যা ঠিক করবেন তা-ই শিরোধার্য। যদ্দিন তা না হয়, তদ্দিন একজন বিধায়ক হয়েও যে নিজের এলাকায় প্রচুর কাজ করা যায়, সেটাই প্রমাণ করব।’

উত্তরায়ণ সমাজদার

বামশূন্য করেও অভিভাবকহীন জলপাইগুড়ি

সাতে ছয়। একটি আসন কোনওরকমে ধরে রেখেছে কংগ্রেসিরা। রীতিমতো অভাবনীয় ফল জলপাইগুড়িতে। যদিও ছ'টির চারটিতেই জয়ী হয়েছেন বহিরাগত তৃণমূলি, কিন্তু সেটাও দলরে সাফল্যেরই ইঙ্গিত। কিন্তু এই সাফল্যের পুরস্কার জুটল না জলপাইগুড়ির কপালে। গৌতম দেবকে যদিও বা তর্কের খাতিরে বা ভৌগোলিক বিচারে জলপাইগুড়ির ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু তাঁরও মন্ত্রিত্ব ‘নিষ্ক্রিয়’ ধরেই নিয়েছে জেলাবাসী। সৌরভ চক্রবর্তীকেও পুরোপুরি জেলার প্রতিনিধি মেনে নেওয়া যায় না। ফলত, জলপাইগুড়ি নিয়ে আওয়াজ তোলার মতো সক্রিয় নেতাই নেই সরকারে। স্বভাবতই খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে শাসকদলের জেলার সব ক'টি শিবির।

জলপাইগুড়ি জেলায় কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছিল ২০১৪-র মাঝামাঝি। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে কংগ্রেস মুখ থুবড়ে পড়লে তৎকালীন কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি এবং জলপাইগুড়ির পুরপতি মোহন বোস একগুচ্ছ কাউন্সিলার নিয়ে ঘাসফুলে পা রাখেন। সঙ্গে শুভেন্দু বোসের মতো যুবনেতা। এই ঘটনার কয়েক মাস আগেই জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি দিদির দলে পা বাড়িয়ে পদ্ধতিটা শুরু করেছিলেন। মোহনবাবু দলবল নিয়ে ঘাসফুলে চলে যাওয়ার কারণে পুরপতিই থেকে গিয়েছিলেন। ২০১৫-র পুরসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূল থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে ২৫টি আসনের মধ্যে ১৫টিতেই

> সৌরভ মন্ত্রিত্ব পেলেন না এবং রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ তাজ্জব হয়ে টের পেলেন যে, তাঁকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর দেওয়া হয়েছে! তুলনায় দুধ-ভাত পর্যটন দপ্তর পেয়েছেন গৌতমবাবু।

জিতে আসেন। এর ফলে জলপাইগুড়ি শহরে তৃণমূল প্রথম সাফল্যের হাসি হেসেছিল।

জলপাইগুড়ি শহর দখলের সেনাপতি হিসেবে মোহন বোস এবং শুভেন্দু বোস তাঁদের নতুন দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি। আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী ওরফে গুটিস এবং শুভেন্দুবাবু পরস্পরের কাছে কংগ্রেস করার সূত্রে অনেককাল ধরেই পরিচিত। সৌরভবাবু হলেন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা থেকে তৃণমূলে যাওয়া কংগ্রেসিদের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। ২০১১-র বিধানসভার ফল বেরবার পরপরই তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। মমতার দলে যোগদানের দিন থেকেই তিনি বেশ গুরুত্ব পেয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি দল বদল করলেও জলপাইগুড়ি জেলায় হাত ছেড়ে ঘাসফুল ধরার তেমন কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি জেলার অপর নেতাদের মধ্যে। হাওয়ায় খবর ভাসছিল যে, মোহন বোস দল বদল করবেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুকুল রায় বুঝতে পারছিলেন যে, মোহনবাবুর উপর জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক কংগ্রেস বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাঁকে তুলতে পারলে জেলা শহর দখল করা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। সৌরভবাবুও কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন।

জেলায় আদি তৃণমূল ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারছিল— এটা কালীঘাটের গোচরে আসতে দেরি হয়নি। সৌরভবাবুকে জেলায় খানিকটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছিলেন গৌতম দেব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে তিনি যে অশোক ভট্টাচার্যর তুলনায় জলপাইগুড়ির প্রতি অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন— এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে তাঁর গোষ্ঠী গোড়ার দিকে ছড়ি ঘোরাচ্ছিল। আগে উত্তম চক্রবর্তী এবং কিষানকুমার কল্যাণী দলের জেলা সভাপতি হিসেবে সফল না হওয়ায় চন্দন ভৌমিককে সভাপতি করা হয়। গৌতম দেব-ঘনিষ্ঠ চন্দনবাবু অচিরেই নানাবিধ আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ায় বিরক্ত কালীঘাট জেলার ব্যাটন তুলে দেয় সৌরভের হাতে। মোহন বোস তৃণমূলে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করতে থাকেন।

২০১৫-র পুরসভা নির্বাচনে মোহনবাবু নিজেকে প্রমাণ করলে সৌরভের ইমেজ আরও উন্নত হয়। অন্য দিকে বিভিন্ন ঘটনায় এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, গৌতম দেবের ছবি কালীঘাটে কিঞ্চিৎ ঝাপসা হতে শুরু করেছে। সৌরভ শিবির উল্লসিত হয়ে ভাবছিল যে, আসন্ন বিধানসভায় তাঁদের 'গুটিস' প্রার্থী হচ্ছেই এবং জেতার পর মন্ত্রী হচ্ছেই হচ্ছে। গৌতম দেব ফুলবাড়ি থেকে জিতলেও যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রক ধরে রাখতে পারবেন না, সেটাও ভাসতে শুরু করেছিল জেলার বাতাসে। তারপর সৌরভ দাঁড়ালেন। জিতলেন। যদিও আলিপুরদুয়ারে তাঁকে 'পদ্মকাঁটা' সইতে হল। গৌতম দেব জিতলেও সংলগ্ন দার্জিলিং জেলার সমতল বা শিলিগুড়ি ও তার লাগোয়া আসনে ঘাসফুল কোথাও ফুটল না।

কিন্তু মন্ত্রীসভা ঘোষিত হওয়ার পর সৌরভ শিবির হতবাক হয়ে দেখল, সৌরভ মন্ত্রিত্ব পেলেন না এবং রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ তাজ্জব হয়ে টের পেলেন যে, তাঁকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর দেওয়া হয়েছে! তুলনায় দুধ-ভাত পর্যটন দপ্তর পেয়েছেন গৌতমবাবু। কিন্তু সৌরভ নেই!

এতদিন বিধায়ক না হয়েও, কেবল দু'টি জেলার সভাপতি থেকেই সৌরভবাবু প্রায় পঞ্চাশটা কমিটি সামলেছেন বেশ সাফল্যের সঙ্গে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরও আছে। তদুপরি জলপাইগুড়ি সদর আসন বাদ দিয়ে বাঁকি পাঁচটিতেই দল জিতেছে। আলিপুরদুয়ারেও তা-ই। সুতরাং বিধায়ক হওয়ার পর তাঁকে মন্ত্রী রূপে দেখার আশাটা তাঁর অনুগামীদের কাছে যুক্তিসংগতই ছিল। বিরোধী দলগুলোও এটা ভাবছিল ভোটের পর। কিন্তু দিদি দিলেন সব এলোমেলো করে! তবে কি তিনি সৌরভকে ডুয়ার্সের সাংগঠনিক কাজে লাগাতে চান? নাকি গৌতম দেবের বিকল্প হিসেবে খাড়া করতে চাইছেন রবি ঘোষকে?

বস্তুত, ডুয়ার্সের রাজনীতির ভরকেন্দ্র শিলিগুড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে মমতা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব বাইরের কাউকে দেবেন— এটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। রবি ঘোষ তাঁর মন্ত্রক তিন দিন কোচবিহার আর তিন দিন শিলিগুড়ি থেকে সামলাবেন বলে ঘোষণা করেছেন। দার্জিলিং জেলায় তৃণমূলের ভবিষ্যৎ মমতার চোখে ভাল ঠেকছিল না। ভোটের ফল বেরবার পর তাঁর আশঙ্কা সত্যি হয়েছে। তাই গৌতম দেবের বিকল্প হিসেবে রবি ঘোষকে তুলে আনলেন।

এটা প্রতিবেদকের বিশ্লেষণ নয়! মন্ত্রীতালিকা ঘোষণার পর জলপাইগুড়ির কোনায় কোনায় সৌরভের অনুগামীরাই এই বিশ্লেষণ নিয়ে বিস্তর চা-সিগারেট উড়িয়েছেন। গৌতম দেবের লোকেরাও সৌরভের মন্ত্রী হতে না পারার ঘটনাটিকে উপভোগ করতে পারেননি। আদি তৃণমূল সমর্থকরা ভেবেছেন, ভালই হল। রবিবাবু এবার যদি গৌতম-সৌরভের বাড়বাড়ন্তে থাবা বসান, তবে বেশ হয়। জেলা শহরে দলের প্রার্থী জেতেনি। পরাজিত ধর্তিমোহন রায় আদি তৃণমূল। জোর গুজব যে, জলপাইগুড়ি পৌর এলাকায় তিনি 'লিড' পাননি দলের একাংশের জন্য। মাত্র এক বছর আগে যেখানে পুরসভা দখল করল দল, এবার সেখানে এতটা পিছিয়ে পড়া! দিদি বেশ করেছেন!

দলের আরেকটি অংশ অবশ্য ভিন্ন বিশ্লেষণ জানিয়েছে। তাদের মতে, সৌরভের উচিত ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করা। কিন্তু তিনি জলপাইগুড়ির ব্যাপারে মোহন বোস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। পুর এলাকা থেকে খানিকটা লিড পেলেই জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার 'প্রেস্টিজিয়াস' আসনটি বাগিয়ে ফেলা যে যেতই, তা ফল বেরনোর পরেই পরিষ্কার। এর দায় মোহনবাবুকেই নিতে হবে।

কিন্তু পিকচার এখনও বাকি আছে পাঠক! এটাও শোনা যাচ্ছে যে, জলপাইগুড়িতে আরও একজন অচিরেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে মোহনবাবুকে পিছনে ঠেলে দিতে পারেন। তিনি সৈকত চ্যাটার্জি। মমতা জানিয়েছেন যে, তিনি তাড়াতাড়ি ডুয়ার্সে দলের সংগঠনে রদবদল ঘটাবেন। সৌরভবাবুর পক্ষে দুটো জেলার সভাপতির দায় সামলানো বেশি দিন সম্ভব নয়। তাই জলপাইগুড়ি জেলার জন্য আলাদা সভাপতি নিযুক্ত হবেন, সেটা ভাবাই যায়। তাহলে সে সভাপতি কি সৈকতবাবু? তিনি গৌতম দেবের লোক বলে পরিচিত। কাজেই সভাপতি হয়ে তিনি জেলায় গৌতম-গোষ্ঠীর সহযোগিতা পাবেন, আবার সৌরভও তাঁকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। রবি ঘোষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতেও সৈকতবাবুর কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে করছেন না সৈকতবাবুর সমর্থকরা।

তার মানে, সৌরভ চক্রবর্তীকে গুরুত্ব দিয়েও জলপাইগুড়িতে তাঁর প্রতিপত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন সুপ্রিমো? কে জানে। দলের সবাই কমবেশি টেনশনে। গত ৭ জুন শহরে তাঁদের বিজয়মিছিলে সৌরভবাবু হাজির থাকলেও মোহনবাবু ছাড়া তেমন কাউকে দেখা গেল না। মিছিলও জমেনি। এক রসিক পথচারীর মতে, 'মিছিল দেখে তো মনে হল না, দু'শো এগারোটা পেয়েছে।'

সব মিলিয়ে দিদির ভাবনার থই পাচ্ছেন না জেলার কর্মীরা। নেতারাও।

অরুণ পন্ডিত

মঘা দেওয়ানির স্বাধীনতা সংগ্রাম কি মনে রেখেছে আলিপুরদুয়ার ?

দেশের মাটিতে জাতীয় পতাকা উড়ছে তিনি দেখেননি। পরাধীন দেশের নাগরিক হয়েই তিনি ইহলোক ছেড়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এ দেশছাড়া করে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন ছিল তাঁর সারাজীবনের সংগ্রাম। খাসমহলের জমির স্বত্ব আদায়ের অধিকার আন্দোলন, খাজনা বন্ধ করে, স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত বয়কট করে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মঘা দাস দেওয়ানি। কিন্তু বারবিশা-কুমারগ্রামের মাঝামাঝি দলদলিতে মঘা দাস দেওয়ানি স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ কিংবা শামুকতলা, ঘাটিবাড়ি, কামাখ্যাগুড়িতে বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি আজও। অথচ রাষ্ট্রদ্রোহী মঘা দাসের বিরুদ্ধে 'স্টেট ভার্সেস মঘা দেওয়ানি' মামলার শুনানির দিন নদীনালা ডিঙিয়ে, ঝাড়-জঙ্গল পেরিয়ে হাজার হাজার মানুষ চৌপথির ওয়্যারহাউসের কাছে আদালত চত্বরে আওয়াজ তুলেছিল 'বন্দে মাতরম্, মঘা দেওয়ানির মুক্তি চাই।' বিস্মৃত সেই ইতিহাসকথা হল মঘা দাস দেওয়ানির কথকতা।

বিতাড়িত মঘা দাস

১৮৬০-৬৫ সাল নাগাদ মঘা দাসের জন্ম। জন্মস্থান কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ সন্নিহিত কোনও গ্রাম। রাজবংশী পরিবারের এই সন্তান পড়াশোনায় ভাল ছিলেন। কোচবিহারের মহারাজার প্রজা হলেও তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, উদারমনা, কিন্তু স্পষ্ট বক্তা।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হলে (১৯০৯) রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে তিন লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। একই সঙ্গে ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে কোচ রাজাদের রোষের পারদও তীব্রতর হয়ে ওঠে। অনেকেই কোচবিহার থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু সঠিক কী অপরাধে জাতীয়তাবাদী বেঁটেখাটো মঘা দাসকে কোচবিহার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানতে পারেননি রাজেনবাবু। তাঁর অনুমান, মঘা দাসের অপরাধ ছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য ওই পরিবারে আজও বহমান।

মঘা দাস চলে আসেন বারবিশা-কুমারগ্রামের মাঝামাঝি দলদলিতে। সেখানে জমিজায়গা নিয়ে তিনি ক্রমে চেংমারি, হেমাগুড়ি, পাগলার হাট এলাকায় একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ওই অনুন্নত এলাকায় একজন প্রগতিশীল, মুক্তমনা, স্বদেশপ্রেমিক মানুষ সহজেই 'দেওনিয়া' হিসেবে মান্যতা লাভ করেন।

দেওনিয়া মঘা দাস

'দেওনিয়া' শব্দটি রাজবংশী-অরাজবংশী সমাজে বহুল পরিচিত। ফারসি 'দীবান' থেকে যেমন 'দেওয়ান' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ঘটেছে, সমাজকর্মে মন্ত্রণাদাতা হিসেবে মুসলিম আমলে 'দেওনিয়া' শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে। আবার দেব, দেও বা দ্যাও থেকেও দেওনিয়ার উৎপত্তি হতে পারে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীপক রায়ের রচনা থেকে জানা যায় যে, ডুয়ার্সে শতখানেক দেবদেবী প্রকৃতপক্ষে কোচবিহার ও ভুটানেরই দেবতুল্য মানুষ। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁরা গ্রাম্য সালিশি, বিচারসভায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং ধনে-মানে শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই দেওনিয়া। মঘা দাস ধনী, বুদ্ধিমান ও জনশ্রেষ্ঠ বলেই 'দেওনিয়া' রূপে মান্যতা লাভ করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য 'দেওনিয়া' শব্দটির অর্থের অপকর্ষ হয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে সর্দারি করাকে বোঝায়।

আচরণ থেকেই মান্যতা আসে এবং মান্যতা থেকে বিশেষ পরিচয় গড়ে ওঠে। মঘা দেওয়ানির ছেলে নিনাও দাস কিন্তু ওই মর্যাদা পাননি। তিনি ধনী, কিন্তু বেপথু। তাই তিনি সমাজে 'মাতাল ধনী' নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

মঘা দাস যে সমাজসচেতন, রাজনীতিসচেতন মানুষ ছিলেন তা তাঁর বিতাড়ন পর্বে, তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কথা থেকে জানতে পেরেছি। ধরে নেওয়া যায়, তিনি ৪৫/৪৬ বছর বয়সে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

খাসমহলের জমি ও মঘা দাস

'তেভাগা আন্দোলন' প্রসঙ্গে আমরা ডুয়ার্সের খাসমহলের জমি নিয়ে 'নন রেগুলেটেড' অঞ্চলে সরকারি নীতি বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি। হাতিপোতা ও কুমারগ্রাম চা-বাগানে ব্রিটিশ বিরোধী শ্রমিক আন্দোলন, টানা ভগৎ আন্দোলনের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করেছি। আমার লেখা 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জলপাইগুড়ি' গ্রন্থে (পৃঃ-৫৯) টনডু চা-বাগানের ২ জন, হাতিপোতা চা-বাগানের ১৮ জন এবং গেন্দ্রাপাড়া চা-বাগানের ৯ জন শ্রমিকের ব্রিটিশ বিরুদ্ধ আন্দোলনে সাজাপ্রাপ্তি (২৯/০৬/১৯১৬ এবং

> আন্দোলনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে চাই প্রচার। জল-জলা-নদীনালা- জঙ্গলে ঘেরা জনপদে গণপ্রচারের একটাই অধিক্ষেত্র, সেটি হল হাটখোলা। কৃষক-শ্রমিকদের মিলনক্ষেত্র হাটখোলাকেই খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সাপ্তাহিক প্রচারক্ষেত্র করে তুলল জাতীয় কংগ্রেস।

৩১/০৮/১৯১৬)-র কথা নামসহ উল্লেখ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও ০১/০৯/১৬ তারিখে আরও ৯ জন শ্রমিকের শাস্তিপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

কুমারগ্রাম আউটপোস্ট থানা ১৮৯১ সালে স্থাপিত হলেও ১৯০৫ সালে সেটি পূর্ণাঙ্গ থানায় পরিণত হয়। কারণ, ওই সময়ে চা-বাগানের শ্রমিক অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে খাসমহলের জমির অধিকার দাবি করে কোচ-মেচ-রাভা-রাজবংশী সমাজে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এরূপ সময়ে দলাদলিতে থিতু হয়েছিলেন মঘা দাস। প্রাগ্রসর মানুষ তিনি। ফলে হাতিপোতা, নিউল্যান্ডস চা-বাগানের শ্রমিকরা যখন ১৯১৬ সালে শ্রমিক সমাবেশ ঘটায় এবং পুলিশের কবলে পড়ে সাজাপ্রাপ্ত হন, তখন মঘা দেওয়ানি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসেন। খাসমহলের জমির অধিকার আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে ক্রমে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

বয়কট আন্দোলন

সারা দেশে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ কুমারগ্রামসহ আলিপুরদুয়ার ব্লকের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল জাতীয় কংগ্রেস। ১৯২০ সালে মহকুমা কমিটি গঠিত হওয়ার পর অতিদ্রুত অঞ্চল কমিটিগুলি গঠিত হতে থাকে। শালবাড়ি থেকে ভাটিবাড়ি— সর্বত্র জাতীয় চেতনা সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯২১ সালে কুমারগ্রামে শাখা কমিটি গঠিত হয়। শাখা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন মঘা দাস।

কুমারগ্রামে তথা পশ্চিম ডুয়ার্সে বয়কট আন্দোলন দু'টি পর্যায়ে সফলতা অর্জন করে। একটি হল খাজনা বন্ধ করে অসহযোগ আন্দোলন এবং অপরটি হল হাট বয়কট আন্দোলন। অসহযোগ ও বয়কট— দুটোই অবশ্য পরস্পরের পরিপূরক। তবু দু'টিই পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

ক) খাজনা বন্ধ আন্দোলন ঃ খাসমহলের জমির স্বত্ব আদায়ের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন ধিকিধিকি জ্বলছিল, এবার অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এবং রাজ্য ও জেলাস্তরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মদতে ওই আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আন্দোলনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে চাই প্রচার। জল-জলা-নদীনালা-জঙ্গলে ঘেরা জনপদে গণপ্রচারের একটাই অধিক্ষেত্র, সেটি হল হাটখোলা। সেখানে বিভিন্ন জনপদ থকে যেমন ব্যাপারীরা আসেন, তেমনই আসেন হাটুরেরা। কৃষক-শ্রমিকদের মিলনক্ষেত্র হাটখোলাকেই খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সাপ্তাহিক প্রচারক্ষেত্র করে তুলল জাতীয় কংগ্রেস।

প্রচারের জন্য চাই স্লোগান। সেসব স্লোগান বহুচর্চিত হলেও পুনরুল্লেখ না করলে ওই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করা যাবে না। প্রচারের নাম খাজনা বন্ধ আন্দোলন— 'নেত্রা ট্যাক্স ক্যাম্পেইন'। ওই আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্লোগান ছিল—

'শোন শোন কংগ্রেসি ভাই
ইংরেজ সরকারের খাজনা নাই।'

মঘা দাস নেতা। ভাটিবাড়ি, শামুকতলা, কুমারগ্রাম— সব হাটে ওই স্লোগান দিয়ে চলল হাট মিছিল। চোঙা মুখে বক্তৃতা দিতে লাগলেন নেতৃবৃন্দ। গোটা ভল্কা পরগনায় উত্তেজনা তৈরি হল। জনমানসে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। খাজনা আদায় তলানিতে ঠেকল। হাট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ডুয়ার্সে। প্রমাদ গুনল ব্রিটিশ সরকার।

খ) বয়কট আন্দোলন ঃ আলিপুরদুয়ার শহরে বয়কট আন্দোলন স্কুল-কোর্টকাছারি বর্জন আন্দোলনে যে জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল, মফস্‌সলের শামুকতলা, কামাখ্যাগুড়ি, কুমারগ্রাম, ভাটিবাড়ি অঞ্চলে তা হাট বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে রূপায়িত হতে থাকে।

এর প্রভাব যে ধূপগুড়িতেও দেখা দিয়েছিল এবং ওই আন্দোলন 'হাতি ছুপ' আন্দোলন নামে একটা আলাদা মাত্রা লাভ করেছিল, তা আমরা 'কিরাতভূমি' পত্রিকা (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ- ৮৫৬-৫৭) সূত্রে জানতে পারি।

ধূপগুড়ির ডাউকিমারি হাটটিকে বড় করবার জন্য ভান্ডানি, খট্টিমারি প্রভৃতি ছোট ছোট হাটকে ভেঙে দেবার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা হাতি দিয়ে হাট ভাঙতে আসেন। উত্তেজিত জনতা প্রতিবাদমুখর হয়ে হাতির গায়ে মশালের ছ্যাঁকা দিতে থাকেন। 'হাতি ছুরা' অর্থ হল হাতি পোড়ানো। ওই হাতি ছুবা আন্দোলনের কথা মানুষ এখনও মনে রেখেছেন, ইতিহাস মনে রাখেনি।

প্রতিটি সরকারি হাটে বা লিজপ্রাপ্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন হাটে সরকারি তহশিলদারগণ খাজনা আদায় করে থাকেন। খাজনা আদায় বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন হাট বয়কট আন্দোলন। এই হাট বয়কট আন্দোলনে স্মরণীয় হয়ে আছেন মঘা দেওয়ানি ও পশুপতি সিং কোঙর।

হাট বয়কট আন্দোলনে বন্ধ হয়ে যায় সাঁতালি প্রমুখ বহু হাট। যেমন শামুকতলা হাটে গোরুর গাড়িতে করে পসারিরা মালপত্র হাটে নিয়ে আসেন। কংগ্রেসি নেতা নলিনী পাকড়াশি, চন্দ্রদীপ সিং, কুলদীপ সিং-এর মতো নেতাদের সহযোগিতায় কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকরা হাটে ঢোকার মুখে রাতের অন্ধকারে গাড়িগুলিকে উলটিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র বিনষ্ট করে দেন। শামুকতলা হাট বন্ধ হয় যায় ভয়ে।

কুমারগ্রামে নিউল্যান্ডস চা-বাগানের সীমানায় ছিল একটি সরকারি হাট। নাম ছিল কুলকুলি হাট। আসলে নিউল্যান্ডস চা-বাগানের একটি ঝোরা থেকে কুলকুল করতে করতে বয়ে চলেছিল কুলকুলি নদী। অমরপুর, জয়দেবপুর, কাটাবাড়ি, চেংমারি, দলদলি, হেমাগুড়ি হয়ে রাধানগরে ওই নদী রায়ডাকের সঙ্গে মিশেছে। নদীর দু'ধারের ওই জনপদের মানুষরা এবং চা-বাগানের শ্রমিকরা ওই হাটের উপর ছিলেন নির্ভরশীল।

কুলকুলি হাটের নিয়ন্ত্রক চা-বাগানের ম্যানেজার। তিনি লালমুখো সাহেব। কুমারগ্রামে, হাতিপোতাতেও সাহেবরা আছেন। তাঁরা প্রতি সপ্তাহে হাটে এসে নানারকম জুলুম করতে থাকেন। হাটে তহশিলদারের জুলুম, গোয়েন্দাদের জুলুম এক অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। জোর করে চলে খাজনা আদায়। পাঁচ-দশজন একসঙ্গে কথা বলতে গেলে গোয়েন্দাদের টিকটিকিগিরি চলতে থাকে। অতিষ্ঠ প্রজাসাধারণ।

এই হাট অন্যত্র সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন চা-বাগানের শ্রমিক নেতা পশুপতি সিং কোঙর এবং রাজবংশী জননেতা মঘা দেওয়ানি। যথা চিন্তা, তথা কাজ। সভা ডাকা হল গোপনে। প্রকাশ্যে উঠল স্লোগান—

'ইংরাজক খাজনা দিমু না
বিলাতি কাপড় পিন্দিমু না,
হাট বন্ধ কুলকুলি
বন্দে মাতরম্‌ হোক বুলি।'

স্থির হল, চা-বাগানের ওই হাটকে সরিয়ে আনা হবে বিজয় চক্রবর্তী নামক এক

স্বদেশির জমিতে। বিজয়বাবুও রাজি। ওই হাট ভেঙে ১৯২১ সালে পালটা হাট বসল নতুন জমিতে। প্রশাসন বহু চেষ্টা করেও বিপুল জনতার সম্মিলিত প্রয়াসকে প্রতিরোধ করতে পারল না। কুমারগ্রাম থানায় পুলিশের সংখ্যা সামান্য। অসহায় দর্শক প্রশাসন।

রাষ্ট্রদ্রোহী মঘা দেওয়ানি

শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের তো এটা রীতিমতো অপমান। নতুন হাট বন্ধ করতে পারেলন না, হাটকে সারিয়ে পুরনো জায়গায় ফিরিয়েও আনতে পারলেন না তাঁরা। এবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে। শুরু হল 'স্টেট ভার্সাস মঘা দেওয়ানি' মামলা।

উভয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে চলল আলিপুরদুয়ারে। সেখানে মহকুমা আদালতে হবে মঘা দেওয়ানি ও পশুপতি সিং কোঙরের বিচার।

আজকের নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলা, ঝাঁ-চকচকে জনপদ, জাতীয় সড়কের ডাবল লেন শতবর্ষ পূর্বে কেমন ছিল, তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেন। নদীনালা ডিঙিয়ে, ঝাড়-জঙ্গল পেরিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছে পুলিশ, চলেছে রাষ্ট্রদ্রোহী জননেতা এবং পিছনে শত শত উদ্দীপ্ত মানুষ। ভাটিবাড়ি, নেপানি প্রভৃতি জনপদে সমবেত জনতার কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে— 'বন্দে মাতরম্', 'মঘা দেওয়ানির মুক্তি চাই'। কামাখ্যাগুড়িতে গড়ে ওঠে গণপ্রতিরোধ। হাজার হাজার মানুষ শামুকতলাতে। পুলিশের গতি রোধ করে তাদের হাত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছিনিয়ে নেবার প্রচেষ্টা সকলের।

গণপ্রতিরোধ ছুটে আসে আরও পুলিশ, মিলিটারি এবং ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের বাহিনী। এরা সম্মিলিতভাবে দুই নিরীহ তপশিলিভুক্ত স্বদেশিকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসে আলিপুরদুযারে।

তখন চৌপথিতে ওয়্যারহাউসের কাছে ছিল আদালত। মামলার শুনানির দিনে হাজির হাজার হাজার স্বদেশি মানুষ। ভয় পেয়ে প্রশাসন মামলাটি এক বাঙালিবাবু সেকেন্ড অফিসারের কোর্টে ট্রান্সফার করে দিল। আদালত ভবন ঘেরাও করে রাখলেন হাজার হাজার মানুষ। স্লোগানে স্লোগানে ভরে উঠল আদালত চত্বর। মহকুমাশাসকের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর বাংলোয়।

নিঃশর্ত মুক্তি পেলেন মঘা দেশ ও পশুপতি কোঙর। মামলাটি তুলে নিতে বাধ্য হল প্রশাসন। জয়োল্লাসে ফেটে পড়েন হাজার হাজার মুক্তিপিয়াসি আলিপুরদুয়ারবাসী।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মঘা দাস

স্বদেশি আন্দোলনের পরবর্তী দু'দেশের কর্মকাণ্ডে মঘা দাসের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করে রাখেননি কেউ। ১৯৪২ সাল। মঘা দেওয়ানির বয়স তখন ৭৬/৭৭ বছর। কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। তখন মানুষ অনেকটাই সংঘবদ্ধ। তিনি নিয়মিতভাবে খবর রাখেন আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দ কীভাবে থানা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নেতা-কর্মীরাও যোগাযোগ রাখছেন তাঁর সঙ্গে।

৮ সেপ্টেম্বরে মঘা দেওয়ানির দলদলির বাড়িতে কুমারগ্রাম থানা অভিযানের গোপন প্রস্তুতিসভা ডাকা হল। বর্ষীয়ান, প্রবাদপ্রতিম নেতার পরামর্শ চাই। সভায় উপস্থিত কামাখ্যাগুড়ির দেবেন দাস, দেওয়ান দাস, গোপাল রায়, সুবিত রায়, নিশাপত রায়, মতিলাল রায় প্রমুখ। পারোকাটা থেকে এসেছেন পোহাতু দাস। খোয়ারডাঙা থেকে উপস্থিত যোগেন বাগানিয়া, রমানাথ ঠাকুর। ভল্কার নৃপেন দাস, চেংমারির অবিনাশ দাস, পাগলার হাটের কালীপ্রসন্ন দাস, দক্ষিণ হলদিবাড়ির ভব্যনাথ দাস, ভাটিবাড়ির স্বর্ণমোহন পণ্ডিত— কত প্রান্ত থেকে কত লোক যে এসেছিলেন ওই সভায়, তা কিছুটা জানা যায় গবেষক জ্যোতির্ময় রায়ের রচনায়।

ডাকঘর পোড়ানো, টেলিগ্রাফের তার কাটা, খুঁটি উপড়ানো, থানা আক্রমণ— সব পরিকল্পনার কথা সে দিন আলোচিত হল। পরিকল্পনা গৃহীত হল। কিন্তু বয়সের কারণে মঘা দাস সক্রিয়ভাবে ওই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিপুরদুয়ার জনপদে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিণতির কথা আমরা এ গ্রন্থে, অন্যত্র বহুবার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছি। তাই সেটির আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

কারণ, মঘা দেওয়ানির প্রপৌত্র রাজেন দাস জানান যে, ১৯৪৩ সালে মঘা দাস পরাধীন ভারতবর্ষেই স্বাধীনতার অরুণোদয়ের প্রত্যাশা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭৯ সালে রায়ডাক নদী রাজেনবাবুদের প্রায় সমস্ত জমি গ্রাস করে নিলে, তিনি দলদলির পিতৃপুরুষদের আবাস পরিত্যাগ করে চলে আসেন বারবিশাতে। ওই বাড়িতে তাঁরই ভাই করুণাকান্ত দাস সপরিবার বসবাস করছেন। এখন দলদলি, মঘা দেওয়ানি শুধু তাঁর কাছে স্মৃতি ও শ্রুতির ভাণ্ডারমাত্র।

উমেশ শর্মা

কৃতজ্ঞতা- সর্বশ্রী রাজেন দাস, করুণাকান্ত দাস, জ্যোতির্ময় রায়, অধ্যাপক সুধীররঞ্জন ঘোষ, পৃথ্বীশ দাস।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

নারী ও শিশুরা নিরাপদ নেই দক্ষিণ দিনাজপুরে

শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করা তো যায়ইনি, বরং পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে আগের থেকে। অন্য দিকে নারীদের অবস্থাটাও যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। নারী পাচার, দেহব্যবসার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। কন্যাসন্তান নিখোঁজ থাকছে। অনেক সময় বহু পরে জানা যাচ্ছে। মূলত গ্রামাঞ্চলে এই ঘটনাগুলি প্রবলভাবে দেখা দিলেও একটু একটু করে শহরাঞ্চলেও এই ঘটনা ঘটছে প্রায় প্রতিনিয়ত।

কী ঘটছে?

ঘটনা ১ সাভানা সরকার। রামপুর উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। উদ্ধার করা হল এলাহাবাদের মিরগঞ্জের নিষিদ্ধপল্লি থেকে।
ঘটনা ২ হিলির লশকরপুরের মামণি খাতুন। আচমকা একদিন নিখোঁজ হয়েছিল। বহু কষ্টে উদ্ধার হল বেঙ্গালুরু থেকে।
ঘটনা ৩ কাশিয়াডাঙার ভানু হেমরম। ওর বাবা-মা প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। যখন বুঝতে পারলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য উদ্ধার করা হল দিল্লি থেকে।
এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে দক্ষিণ দিনাজপুরে। জলসরের পূজা, মাহিনহরের প্রিয়া, বোয়ালদারের সেরেস্টিনা, শেল্লাদিঘির শ্যামলী, আরও যে কত মেয়ে ফাঁদে পড়ে বেপাত্তা হয়েছে, সঠিক হিসাব নেই।

কীভাবে ফাঁদ পাতা হয়? অর্থই অনর্থর মূল

ধরা যাক কারও গ্রামে বাড়ি এবং আদিবাসী পরিবার। পরিবারে অভাব-অনটন চূড়ান্ত। একজন মহিলা আদতে ওই গ্রামেরই কিংবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের। সেই আদিবাসী পাড়াতে ওর যাতায়াত বন্ধুর মতো। ফলে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই হাঁড়ির খবর জানে। এটাও জানে, কোন কোন বাড়িতে অল্পবয়সি মেয়ে আছে। কিছুদিন যাতায়াত করার পর ওই বাড়িগুলিতে সে মোক্ষম প্রস্তাব দেয়, 'আপনার মেয়েকে আমার হাতে দিন। বাইরে ভাল কাজের পরিবেশ আছে। রোজগার হবে, বাড়ির জন্য টাকাও পাঠাতে পারবে।' আপাতভাবে যে পরিবারে আর্থিক-অনটন আছে, সেই পরিবারের বাবা-মায়ের কাছে ওই প্রস্তাব ভীষণ লোভনীয়। তাই তারা সহজেই রাজি হয়ে যায়। বাইরের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ থাকলে সেই মহিলা আশপাশের গ্রামের নানা রেফারেন্স টেনে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, এর আগেও যারা গিয়েছে, তারাও ভাল আছে, ফলে কোনও সমস্যাই নেই। বাইরে থেকে মেয়ে ক'দিন পরপর ফোন করতে থাকে। টাকাও পাঠায়। কিন্তু একসময় সব বন্ধ হয়ে যায়। মারিয়ম হেমরম সিংদের তখন টার্গেট হয় আরও একজন।

পরিবারের প্রধান যেখানে মহিলা, এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে বাবা নেই, মা-ই প্রধান। সেই পরিবারই লিঙ্কউওম্যানদের সফ্ট টার্গেট হয়। একদিকে বহু লড়াই, অন্য দিকে সমাজের নানান প্রতিকূলতা— মায়ের নিজের জীবন এমনিতেই ক্ষয়ে থাকে। এই অবস্থায় মেয়েকে কোনওভাবে পার করে দেওয়াটাই যেন তার স্বস্তির নিঃশ্বাস। ফলে অনায়াসেই স্কুল না যাওয়া তরুণীদের হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়। এই পথে শিশুকন্যাদেরও হাসিল করা যায়।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবন

যে মেয়েটির উঠতি বয়স, ১২ কিংবা ১৩ অথবা ১৪, নিদারুণ দারিদ্র নিত্যসঙ্গী, তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা খুব কঠিন কিছু কি? মজাটা হচ্ছে, প্রথমেই সে এটাকে ফাঁদ বলে ভাবতে পারে না। বাড়ি থেকে দোকান কিংবা স্কুলে যাওয়ার পথে একটু তাকানো, একটু ইশারা। ব্যাস। আর কী? তারপরই মন দেওয়া-নেওয়া। বাড়ি থেকে পালানো। অবশেষে সমস্ত কিছু খুইয়ে বসা।

রঙিন দুনিয়ার প্রলোভন

একটা মোবাইল ফোন কেনা এখন কোনও ব্যাপারই না। চাইনিজ মোবাইল থাকাতে ব্যাপারটা আরও সহজ। ৫০০, ৬০০, ৭০০ টাকা দিয়েই এখন মোবাইল হয়ে যায়। এর পর ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, অল্প ক'দিনের বন্ধুত্ব। হোক না ভার্চুয়াল দুনিয়া, আদানপ্রদান। তারপর রঙিন দুনিয়ার, নতুন জীবনের প্রলোভন। অনেক সময় বিয়েও হয়, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মেয়েটি আবিষ্কার করে সেই ছেলেটির আসল রূপ। এ তো গেল কন্যাসন্তানদের কথা। পুত্রসন্তানরাও কি নিরাপদ? তাদের শৈশব, ভবিষ্যৎও কি সুরক্ষিত? একদমই নয়।

কাজের খোঁজে বাইরে

প্রত্যন্ত গ্রাম বা গ্রামাঞ্চলের ছেলেরা, বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার, স্কুল ড্রপ আউট, তারা কারও মাধ্যমে (গ্রামে গ্রামে বাইরের কাজে পাঠানোর এজেন্ট থাকে) বিদেশ (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে), বিশেষত মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, দিল্লি বিদেশ বলে পরিগণিত হয়, এমনকি মধ্য প্রাচ্যেরও কয়েকটি দেশে কেউ কেউ চালান যায়। এদের

অধিকাংশরই বয়স ১০-১৪-র মধ্যে। কেউ বা কনস্ট্রাকশনের কাজে, কেউ বা মিস্ত্রি, কেউ বা কয়লাখাদানে অতিবাহিত করছে তাদের শৈশব। আর কিছুদিন পর বাধিয়ে ফেলছে ভয়ংকর রকমের অসুখ। কারণ তাদের এমন জায়গায় রাখা হয়, এমন খাবার খেতে দেওয়া হয়, এমন কড়া নজরে রাখা হয়, তা নারকীয় বললেও কম বলা হয়। এমনই এক অভিজ্ঞতার কথা বলল অযোধ্যা গ্রামের রাম লোহার, যে কিছুদিন আগে কোনওরকমে পালিয়ে এসেছে। আবার বহুতলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের।

বাঘের ঘরে ঘোগ

বাইরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটত। তখন চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতাল, ওই নার্সিং হোমে স্থানান্তরও করা হত। চিকিৎসা চলাকালীন শরীর থেকে কিডনি কেটে নিয়ে চালান করে দেওয়া হয়েছে অন্য দেশে। এমনটাও ঘটেছে আকছার। প্রথমে ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। শারীরিক গোলযোগ শুরু হওয়ার পর জানা যায়। ঘটনাপরম্পরা মিলিয়ে হাসপাতাল, নার্সিং হোম বদলের আসল রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। ভুলকিপুরের কিডনি খোয়ানো রতন লোহার সেই সর্বনাশেরই কিস্সা এখনও শুনিয়ে চলে।

কার্যকারণ অনুসন্ধান

খোঁজখবরের শুরুতে বলতে হয় চাইল্ডলাইনের কথা। নারী পাচার আর শিশু নিরাপত্তা নিয়ে যারা নিরন্তর কাজ করছে। এ কাজে তাদের জীবনের ঝুঁকি আছে প্রতিপদে। তাদের অভিজ্ঞতা কী? কী বলছে তারা? পরিস্থিতি চলেছেই বা কোন দিকে? কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে চাইল্ডলাইন এ জেলায় ২০০৮-০৯ থেকে কাজ শুরু করেছে। তারই কোঅর্ডিনেটর সুরজ দাস। সুরজ জেলার পরিচিত কবিও। এসব কথা জিজ্ঞেস করতেই সুরজ বলল, পরিস্থিতির ভয়াবহতায় কবিতা লেখা মাথায় উঠেছে। প্রতি মাসে অন্তত ৮-৯ জন হারিয়ে যাওয়া, স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া, কাজের খোঁজে বাইরে গিয়ে বিপদে পড়া শিশুদের খোঁজে আসে। যখন আর কোথাও কোনও কিছু করতে পারে না, তখন চাইল্ডলাইনের দ্বারস্থ হয় বাড়ির লোকজন। আমরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কখনও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে, কখনও নিজেরাই বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ থেকে এইসব শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। কখনও নিষিদ্ধপল্লি, কখনও বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার আগ-মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে আসি। এই ক'বছরে প্রায় ৫০০ নাবালিকা ও শিশুকে উদ্ধার করেছি। বাল্যবিবাহ একটি বড় সমস্যা এই জেলায়, জানাল সুরজ।

শিকারি শিকার ছাড়ে?

জাল ফেলে শিকার করার পর এত সহজে ছেড়ে দেয়? পালটা ঝামেলা করে না কোনও? সুরজ জানাল, যারা নারী দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তারা কেউ আসলে ঝামেলা চায় না। ওরা একটা হিসেব করে। মোটামুটি ৪-৬ মাস সেই মেয়েটিকে দিয়ে ব্যবসা করাতে পারলেই ওদের লাভ থাকে। তাই ওই ক'টা মাস গেলেই পুরনো মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে নতুন শিকার খোঁজে।

জীবনের ঝুঁকি?

হুমকি তো প্রতিনিয়তই পাই। সেগুলোকে আর ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। তবে একবার বেঙ্গালুরু থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় থ্রেট খেয়েছিলাম। মেয়েটি হিলির লশকরপুরের। আমাকে মারার সুপারি দেওয়া হয়েছে বলে আমার কাছে খবর আসে। তখন হিলি থানার ওসি ছিলেন সৌম্যজিৎ রায়। আমি ওসি'র দ্বারস্থ হই। জানা যায় ফোনটা বর্ধমান থেকে ছিল। সে সময় আমার বন্ধু বিনিদ্র রজনি গিয়েছে। নারী পাচারচক্রের পান্ডাই ফোনটা করেছিল। পরে অবশ্য কিছুই হয়নি।

চক্র দক্ষিণ দিনাজপুরে কতটা সক্রিয়?

ভীষণভাবেই সক্রিয়। বিভিন্ন ব্লকের বহু গ্রামেই চক্রের ফাঁদ পাতা আছে। কোথাও এজেন্ট পুরুষ, কোথাও বা মহিলা। এরকম বেশ কয়েকটি চক্র আছে এ জেলায়। তপনে এমন একটি চক্র ভীষণ সক্রিয়। প্রশাসনও জানে, কিন্তু এদের বেশি দিন জেলে রাখা যায় না। কেননা এদের হাত ভীষণ লম্বা, খানিকটা হতাশ গলায় বলল সুরজ।

উদ্ধার তো হয়, তারপর!

এর পরের চিত্রটাই বড় সঙিন। কিছুদিন আগে প্রিয়া বলে একটি মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম এলাহাবাদের মিরগঞ্জের নিষিদ্ধপল্লি থেকে। মেয়েটি কিছুদিন থাকল বাড়িতে। কিন্তু আমাদের সমাজও তো সাবালক হয়নি। কাঁচা টাকায় অভ্যস্ত ওই মেয়েটির চাকচিক্যময় জীবন সমাজ প্রত্যাখ্যান করল। মেয়েটিও ১৩ দিনের মাথায় স্বেচ্ছায় চলে গেল। এর আগে বোল্লার একটি মেয়েও একইভাবে চলে গিয়েছিল। সে আক্ষেপ সারাজীবনেও যাবার নয়। সরকারের পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা নেই। সব থেকে বড় কথা, এ জেলায় মেয়েদের সরকারি হোমও নেই। এবার আক্ষেপ, হতাশা সব যেন মিলেমিশে গেল চাইল্ডলাইনের জেলা কোঅর্ডিনেটর সুরজ দাসের গলায়।

কী বলছেন সরকারি হোম কর্তা? সিডব্লিউসি চেয়ারম্যান?

বালুরঘাটেই রয়েছে নাবালকদের জন্য সরকারি হোম 'শুভায়ন'। সুপার দাওয়া দোরজি শেরপা বললেন, হোমের পরিবেশ আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। তবে কিছুদিন আগে তিওড়ে বেসরকারি হোমে যে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল তা হত না, যদি জেলায় নাবালিকাদের জন্য সরকারি হোম থাকত। একই কথা শোনা গেল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান চিরঞ্জীব মিত্রর মুখেও। নাবালিকাদের সরকারি হোমের পক্ষে সওয়াল করলেন তিনি। আর বললেন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিডব্লিউসি বিষয়টি কী, সেটা ছিল অজানা। সাধারণ মানুষ শুধু নয়, পুলিশ প্রশাসনের একাংশের মধ্যেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না সিডব্লিউসি নিয়ে। তবে এখন অবস্থাটা বদলেছে। মানুষকে অনেকটাই জানানো গিয়েছে যে, সিডব্লিউসি-র মাধ্যমে তারা তাদের সন্তানকে রক্ষা করতে পারে। আমরা মূলত চাইল্ড ম্যারেজ, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ আর চাইল্ড ট্রাফিকিং-এর উপর জোর দিয়েছি। সম্প্রতি জেলার বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে এইসব নিয়ে সচেতনতা শিবির করলাম। সাড়া পাচ্ছি। পরিকাঠামোর উন্নতি ছাড়াও আরও প্রচুর কাজ বাকি।

অতএব?

চাইল্ডলাইনের প্রচেষ্টা আছে, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রতিনিয়ত আন্তরিক উদ্যোগ আছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করা বাকি। সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে চাইল্ডলাইন, সিডব্লিউসি প্রশাসনকে। নইলে এভাবেই শিশুশ্রম চলতে থাকবে, বিক্রি হবে শৈশব, বিদেশে পাচার হয়ে যাবে আর ফুলের মতো পবিত্র কুঁড়িদের জায়গা হবে নিষিদ্ধপল্লি। শুধু গ্রামাঞ্চল নয়, শহরাঞ্চলেও এই ঘটনা ঘটছে। বালুরঘাট শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায়, মাহিননগরের হাজিপুরে, আমার-আপনার বাড়ির পাশে— পরিস্থিতি কিন্তু ভয়াবহ। এখনই সতর্ক না হলে, প্রতিরোধ গড়ে না তুললে বিপদ। কারণ, আমার-আপনার বাড়ির শিশুটিও আর নিরাপদে নেই। ঠাকুরপুরার প্রণব রায়, তিওড়-বালুরঘাটের সুরজ দাশ, গঙ্গারামপুরের চিরঞ্জীব মিত্রর হাত শক্ত করতে হবে। শিকড় অনেক গভীরে। শিকড়কে উপড়ে না ফেললে বিপদ আজ এবং ভবিষ্যতেও।

সবুজ মিত্র

খুচরো ডুয়ার্স

টিটিটকারি

আমরা জানি, রক্ষক কখনও ভক্ষক হতে পারে না। তবুও জানলেন যে, সে দিন হিলি বর্ডারে এক সীমান্তরক্ষী এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে। ছি ছি! প্রতিবেশীর ডুয়ার্সে এসব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ! তবে

ডুয়ার্সও বাদ রাখেনি কিছু। সন্দেশ এই যে, রেল আধিকারিকেরই স্ত্রীকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে শ্লীলতাহানির খেলা খেললেন এক কট্টর ‘টিটি’। হ্যাঁ মশাই, উনি আজকাল টিকিট চেকের সঙ্গে সঙ্গে ‘অন্য কিছুও’ চেক করা শুরু করে দিয়েছেন। তবে ট্রেনে ঘটনাটি ঘটিয়েও তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। ধরা পড়লেন সুন্দরী ডু য়ার্সের নিউ আলিপুরদুয়ার জংশনে। যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার!

বাইসাম

হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, থুড়ি পড়ছেন। এটাকে বাইসন প্রজাতির কোনও ভায়রাভাই বলে ভাববেন না কিন্তু! এটা হল একটা সন্ধি। নিপাতনে সিদ্ধ। ‘বাইক’ এবং ‘আসাম’ যোগ করে এরকম একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনাটি হল এই যে, আসামের দু’জন আসামি আমের দেশ মালদা থেকে একটা আস্ত বাইক নিয়ে ভাগলবা। তারা ডিরেক্ট আসামে চম্পট দিতে চেয়েছিল বাইকে চড়েই (ভাবা যায়!) তবে সে গুড়ে বালি ফেলল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালির পুলিশ। ওঁরা চেকপোস্টে এই দুই আসামিকে জব্বর প্যাঁচে ফেলে সমস্ত পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দেন। কিন্তু কথা হল যে, বাইক চুরির জন্য আসাম থেকে মালদা কেন? ডুয়ার্সে কি বাইক কম পড়িয়াছে?

দোহাই দাদা

কোচবিহার থেকে এবার ৭২ আসনের বিমান ওড়ানোর পরিকল্পনা। তা দাদা, আসন যা-ই হোক না কেন, দয়া করে সকাল সকাল কলকাতায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিস বাপ! বিমানে চড়ে কোচবিহার থেকে বিকেলে রাজধানীতে নামলে কোন ব্যবসার কাজটা হবে শুনি!

এককাবরোধ

এটাও একটা অবরোধ। তবে সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় পথ অবরোধ। এই জাতীয় অবরোধের দম আর কার থাকবে হস্তী ছাড়া? এক জলজ্যান্ত গজরাজ পাক্কা এক ঘণ্টা লাটাগুড়ি মহাকালধামের খুব কাছেই বেজায় খুশির মেজাজে জাতীয় সড়কে দণ্ডায়মান ছিল। ওঁর আপন খেয়ালে যান চলাচল বন্ধ হওয়ায় দু’দিকের রাস্তায় প্রচুর গাড়ির লম্বা লাইন। উনি মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে দেখেন। অনেকে ছবি তোলার চেষ্টা করেছেন। উনি সে সুযোগও দিয়েছেন। দারুণ দারুণ পোজ। কিন্তু সেলফি তুলতে কেউ এগিয়ে এসেছিলেন কি না, এসে থাকলেও গজরাজ সে সুযোগ দিয়েছেন কি না তা রসিক পাঠককে জানাতে পারছি না।

হবে?

এতদিন এদের অত্যাচারে মোটামুটি সবাই চুপচাপ ছিল, কিন্তু এবার আর নয়। হোক কলরব। করবি তো কর একেবারে খোদ গৌতম দেবেরই পাড়ায়! আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, শিলিগুড়ির পাড়ায় একদল বৃহন্নলা ভাঙচুর চালাল বিয়েবাড়ির মধ্যেই। তোলা আদায়ের ব্যাপারে ঐকমত্য না হওয়াতেই নাকি এই কাণ্ড! তা এমনটা তো হয়েই থাকত! কিন্তু সে দিন পর্যটন মন্ত্রীর পাড়ায় নাকি বেশ বাড়াবাড়িই হয়ছে। গালাগালি ছাড়াও বৃহন্নলাবাহিনী নাকি ধরে ধরে লোকজনকে ঠেঙিয়েছে! ফলে পুলিশ নড়েছে। জোর পদক্ষেপও নাকি গ্রহণ করা হচ্ছে। হলে ভাল! না হলে আরও ভাল! তবে মন্ত্রীমশাইয়ের খাস তালুকে হওয়ায় মনে হচ্ছে কিছু হবে।

ইস্কুল

ডুয়ার্সে তো এখন গরম নেই। তবে গরমের ছুটি বেড়েই চলেছে! এ কী অনাসৃষ্টি! আরে বাবা, ছাত্রদের অভিভাবকরা যে এবার বেজায়রকমভাবে গরম হয়ে উঠবেন। ভাবতে পারছেন ব্যাপারটা! কেউ কেউ তো এ নিয়ে চায়ের দোকানে লাগিয়ে দিয়েছেন জোরদার আড্ডা। এবার একটা গল্পের খোরাক পাওয়া গিয়েছে বাপ। সে দিন জয়ন্তির এক ‘বে’রসিক পথচারী তো গেয়েই উঠলেন, ‘গরম গরম তো কুল/ এবার তো খুলুক স্কুল।’ তা গরমের ছুটিও ফুরাতে চলল আর গরমেরও ইনিংস শুরু হল। ভাল আবহাওয়ায় বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে হাঁসফাঁস গরম আর ভাসানো বর্ষায় ইস্কুল যাওয়াটা কি একটা শাস্তি নয়?

সুরাবরোধ

আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ— এক, হতে পারে বিরাট বিক্ষোভসহ দাবি নিয়ে মিছিল। দুই, পথ অবরোধের মাধ্যমে দাবি জানানো। তবে আমরা এখানে আন্দোলনের তত্ত্ব বিশ্লেষণে যাওয়ার চেষ্টা করছি না। মানে ব্যাপারটা হল, এরকমভাবেও যে বিক্ষোভ জানানো যায় তা আমাদের জানা ছিল না

গো! শেষকালে পথ অবরোধ করলি মদের বোতল সাজিয়ে? হ্যাঁ, এমনটাই ঘটেছে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ির প্রধান সড়কে। এক বেজায় সাহসী রিকশাওয়ালা প্রকাশ্যেই মদ পাচার করছিলেন। জনতা টের পেয়ে খেপে বেগুনি হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাণ্ডে। ফলে পাচার হওয়া বোতল সাজিয়ে অবরোধ। খবর পেয়ে পুলিশের আগে রসের রসিকরা ছুটে এলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশই জিতেছে। তাঁদের আশ্বাসে অবরোধ উঠে গিয়ে শুরু হয় বোতল ভাঙার কাজ। সে কাজে স্থানীয় যুবকরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মাতালদের হাহাকার নাকি পরদিনও শোনা যাচ্ছিল!

মাথাভাঙার শিরঃপীড়া

পথে নামলেই মাথাভাঙার পথিকরা বেজায় টেনশনে পড়ে যাচ্ছেন আজকাল। শহরের বাইকগুলো নাকি খুঁজে খুঁজে ধাক্কা দেওয়ার

জন্য ঘুরে বেড়ায়। অপ্রশস্ত রাস্তায়, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে সেসব ছোটে, যেন শহরটা একটা ফর্মুলা ওয়ানের আখড়া। হাত-পা-মাথা-কোমর ভেঙে পথচারীর হাসপাতালে গমনের ব্যাপার তো ঘটছেই আকছার। মারাও গিয়েছেন। কিছু অর্বাচীন বালক নাকি ধাক্কা মারবে বলেই বাইক নিয়ে বেরুচ্ছে রোজ। বাচ্চা আর বুড়োদের ভাবনাই সব চাইতে বেশি। উল্কার গতিতে তেড়ে আসা যমদূতগুলোর আওতা থেকে চট করে সরে যেতে পারেন না তাঁরা। ফলে টেনশন। পুলিশ নাকি সব জানে! এখন কবে তাঁরা মাথাভাঙাবাসীর নতুন মাথাব্যথা সারানোর বড়ি জোগান, সেটাই দেখার।

হনুমানায়না

আয়নায় 'দাগ' লেগেছে। আজ্ঞে ঠিক 'দাগ' নয়, বরং পুরো আয়নাই ভোগে। আয়নায় নিজেকে দেখেই অন্যের উপস্থিতি ভেবেছে হনুমান। আর তাতেই গল্প গ্যারেজ। আরে, সেই পঞ্চতন্ত্রর গল্পটা পড়েছেন তো? সেই যে সিংহ আর খরগোশ। কেসটা অনেকটা ওইরকমই। মালবাজারের চেল বস্তিতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে ওই হনুমান, আর যথেচ্ছভাবে 'লঙ্কাকাণ্ড' শুরু করে দেয়। শেষমেশ 'রামচন্দ্র ঠাকুর' নামে এক নাপিতের সেলুনে প্রবেশ করেই হনুমানজির লেজ গরম হয়ে যায়। রামবাবুর সেলুন জেনেও ভক্তির তিলমাত্র না দেখিয়ে চারদিকে লাগানো আয়না ভাঙতে শুরু করে দেয় সেই কপি। আয়নায় আয়নায় অনেকগুলো প্রতিবিম্ব দেখে মাথাটা আসলে পাগলেছিল বেচারার! কে না জানে যে, 'বালি' নিজেকে আয়নায় দেখে 'সুগ্রীব' ভাবে!

খেল বাইসাইকেল

এতদিনে কাজে লাগতে চলেছে 'সবুজ সাথী', সত্যিকারের কাজে। হ্যাঁ, সবুজ সাথী চড়েই রেকর্ড গড়ে ফেলার পণ করেছে জলপাইগুড়ির দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। 'কিছু একটা করতে হবে সাইকেল পেয়ে'— এই ধারণা থেকেই রেকর্ড গড়ার জন্ম তথা স্বপ্ন দেখেছিল সে। এতদিন তো সাইকেল পাওয়া নিয়ে ঝামেলাই ছিল সাংবাদিকদের স্টোরি। এবার তারা কভার করতে লেগে পড়বে 'সবুজ সাথী' রেকর্ড। পাহাড়-সমুদ্র ছুঁয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিতে যাবে সে। মন্দ লোকরা অবশ্যি বলছে যে, সবুজ সাথী সাইকেল নাকি অদ্দুর চলবেই না। মালদাতেই ভেঙে যাবে। সেখানে জোটের বাড়বাড়ন্ত কিনা!

বোতল আর নীল জল

উঁহু! এটা কোনও কবিতার বইয়ের নাম নয়। ডুয়ার্সের অনেক জনপদে বাড়ির সামনে নেড়ি সারমেয়দের পটি করা আটকাতে বোতলে নীল জল ভরে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। জোর গুজব, এই বোতল দেখলে নেড়িরা নাকি দূর থেকে যাতায়াত করে। কাজও নাকি দিচ্ছে মোক্ষম। শুনে যুক্তিবাদীরা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে। সারমেয়রা কেরোসিন তেলের গন্ধ পেলে এগয় না। তবে কি ওরা নীল জলকে কেরোসিন বলে ভুল করছে? কিন্তু ওরা কি রঙে চেনে না গন্ধে চেনে? ডুয়ার্সের বাইরে গঙ্গারামপুরেও নাকি এই টেকনিক সফল! ব্যাপারটা তো হাইলি সাসপিশাস রে বাপে!

রহস্য বটে

বালুরঘাটের কাছে ভাটপাড়া গ্রামের স্বাধীন মুর্মু মাঠে গিয়েছিলেন ছাগল বাঁধতে। খুব সাধারণ ঘটনা। এতই সাধারণ যে লেখার কিছু নেই। তবুও লিখতে ইচ্ছে, কারণ ছাগল বাঁধতে গিয়ে স্বাধীনবাবু ভ্যানিশ হয়ে যান। অতঃপর একটা ডোবাতে ভাসতে দেখা যায় তাঁর মৃতদেহ। ঘটনাটা দুঃখজনক হলেও খুব রহস্যময় বটে। ছাগলটা এ কাজ করেনি নিশ্চিত। তবে করল কে?

টুক্রাণু

ডুয়ার্সের লোকালয়ে ময়ালের হানা। বিরল প্রজাতির বনরুই মালবাজারে। গরমে প্রাণ জুড়াতে নদীতেই প্রাণ দিল দুই কিশোর। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ঢুকে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি দিব্যি ডাক্তার সেজে রোগী দেখছিল। হাতির মৃত্যু রুখতে নাইট ভিশন ক্যামেরার ব্যবস্থা রেল দপ্তরের। জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোডে পুরসভার বানানো ফুটপাথ অদৃশ্য। কোচবিহারের নতুন মসজিদে হজযাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গরমে ডুয়ার্স জুড়ে হিট তালশাঁস। ভোটের পর সবুজ আবির বিক্রিতে খুশি ডুয়ার্সের ব্যবসায়ীরা।

এখন ডুয়ার্স ব্যুরো

জাল নোট ও অবৈধ অস্ত্র কারবারের স্বর্গরাজ্য বৈষ্ণবনগর

বৈষ্ণবনগর নামটা শুনলেই অনেকে এখন চমকে ওঠেন। সাম্প্রতিক বৈষ্ণবনগরের কার্যকলাপ মনে আনলেই এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রায়শই মালদা জেলার কালিয়াচক ব্লকের এই স্থাননামটি জেলা তথা রাজ্যবাসীর মুখে মুখে ফেরে। এ রাজ্যের বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে পত্রপত্রিকায় একাধিকবার শিরোনামে উঠে এসেছে এই এলাকা। অপরাধজগতের স্বর্গরাজ্য— এটাই বৈষ্ণবনগরের অন্যতম পরিচয়, বলা ভাল শিরোপা। সম্প্রতি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত 'বৈষ্ণবনগর বোমা-কাণ্ড'। জৈনপুর অঞ্চলে বোমা বানাতে গিয়ে মৃত্যু হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যসহ মোট চারজনের। আর সেই বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে মৃত্যু হয় সিআইডি'র বম্ব স্কোয়াডের দুই কর্মীর। এ তো সাম্প্রতিক কালের একটি ঘটনামাত্র। ফ্ল্যাশব্যাকে গেলে ঘটনা-দুর্ঘটনার কূলকিনারা মিলবে না।

কালিয়াচক ৩ নং ব্লক। আয়তন ১২৭.৩৭ বর্গকিমি। গ্রামের সংখ্যা ২৫৬। এর মধ্যে ৩০টিরও বেশি গ্রামের মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। মালদা জেলার অন্যতম সীমান্তবর্তী ব্লক এটি। সীমান্তরক্ষীবাহিনীর দু'টি হেডকোয়ার্টার ও আটটি আউটপোস্ট রয়েছে। একটি মাত্র থানা। লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৫৬,৭৬৬। এর মধ্যে ১,৩২,৬৪৮ জনই নিরক্ষর। বর্ডার আউটপোস্টগুলি হল শোভাপুর, দৌলতপুর, শব্দলপুর, সুখদেবপুর, মহব্বতপুর, শশানি, নওদা, মিলিক সুলতানপুর। ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়। যথাক্রমে পারদেওনাপুর, শোভাপুর, বাখরাবাদ, গোলাপগঞ্জ, চুরি অনন্তপুর, আকন্দবাড়িয়া। পাশেই বয়ে গিয়েছে গঙ্গা নদী। সীমান্ত এলাকায় কিছু জায়গা রয়েছে কাঁটাতারহীন। স্বাধীনতার পর বৈষ্ণবনগর এলাকায় উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও হয়নি। চূড়ান্ত অনুন্নয়ন মাথা তুলে থাকলেও বেআইনি কারবারে মোটা টাকা কামাইয়ের হাতছানি রয়েছে। এলাকার মানুষজন দ্বিতীয়টির উপর ঝুঁকে যাওয়ায় বৈষ্ণবনগরের অবস্থান এখন খ্যাতি বা কুখ্যাতির শীর্ষে।

এলাকায় ঢুকলেই চোখে পড়বে রাস্তার দু'ধারের কয়েকশো একর জমি জুড়ে প্রস্ফুটিত পোস্ত গাছ, যা নাকি এখন বৈষ্ণবনগরের ঐতিহ্য! ধান চাষ বাদ দিয়ে এলাকার কৃষকরা পোস্ত চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কেনই বা হবেন না? মিলছে আগাম চাষের টাকা, বাড়তি লাভ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পোস্ত চাষি বললেন, 'এক বিঘা পোস্ত চাষ করলে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লাভ। তাহলে ধান চাষ করব কেন? ঝুটঝামেলা যা আসে তা 'দাদারা' দেখে। আমার কোনও 'রিস্ক' নাই। এই কারবারে বৈষ্ণবনগর স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। জমিতে বাড়ির মহিলাসহ বাচ্চাদেরও কাজে লাগাচ্ছে পোস্ত চাষিরা। স্কুল বাদ দিয়ে ছাত্রছাত্রীরাও এ কাজে নেমেছে। হারাচ্ছে শৈশব। অপরাধের তালিম নিয়েই বড় হচ্ছে এলাকার কচিকাঁচারা। আর পোস্তর আঠা মাদক তৈরির জন্য পাচার হচ্ছে নেপাল, আসাম,

উত্তরপ্রদেশসহ বাংলাদেশে। ধরপাকড় চলে নিয়মিত। তাতে উৎসাহে ঘাটতি পড়ে না। কারবার আরও বাড়ছে বই কমছে না।

প্রতি বছর রুটিনমাফিক অভিযান চালিয়ে পোস্ত গাছ উপড়ে ফেলে আবগারি দপ্তর। সেটাও নাকি লোক দেখানো। বেআইনি পোস্ত কারবারিরা বলে, পুলিশ, আবগারি, এমনকি বিএসএফ'কে পয়সা দিয়ে হাতে রাখি। পাঁচ-দশ বিঘা তো কাটবেই, না হলে লোকে সন্দেহ করবে। পুলিশের মাথাদের আমরা মাসোহারা দিই। সঙ্গে আছে শাসকদলের ক্ষমতা। কখনও জমি লিজ নিয়ে, আবার কখনও কৃষকদের আগাম টাকা দিয়ে পোস্ত চাষ করি।' এ তো গেল পোস্ত চাষের কাহিনি। আর যার জন্য বৈষ্ণবনগর খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছে তা হল জাল টাকা। কালিয়াচক ৩ নং ব্লকে জাল টাকার কারবারির সংখ্যা এখন কম নয়। এই ইন্ডাস্ট্রি এখন লাভের অঙ্কে বৈষ্ণবনগরে প্রথম। আর তার জাল ছড়িয়েছে রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে। দিল্লি, মুম্বই, উত্তরপ্রদেশ, কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জাল টাকা সরবরাহ করে বৈষ্ণবনগরের জাল নোট কারবারিরা। কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাল নোটগুলি বাংলাদেশ থেকেই আসে। তারপর সেগুলো ভারতের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই কারবারের উৎসস্থল হল বৈষ্ণবনগর। টাকার লোভে এই কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে সমাজের সব শ্রেণির লোকজন। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে জাল নোট পাচারের কাজে কমবয়সি যুবক-যুবতী, কলেজপড়ুয়া, এমনকি স্কুলপড়ুয়াদের কাজে লাগাচ্ছে জাল নোটের কারবারিরা।

জাল নোট উদ্ধার এখানে নিত্যদিনের ঘটনা। বহু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারও হচ্ছে। তারপরও এই কারবারের রমরমা এতটুকু কমেনি। বৈষ্ণবনগরের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই, যে চোরা পথে বাংলাদেশ থেকে জাল নোট আসা খুব সহজ। এই কারবারে কালিয়াচক ৩ নং ব্লকে সাতজন মূল পান্ডা আছে, যারা বাংলাদেশের নোট কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দিব্যি এই ব্যবসা চালায়। বৈষ্ণবনগরের এই সাতজন মূল পান্ডা কখনও জনসমক্ষে আসে না কিংবা জাল নোট পাচারও করে না। তাদের কাজ হল, কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের হতদরিদ্র মানুষদের জালে তুলে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে নোট পাচারে উৎসাহিত করা। আর এ কাজে ১০০ শতাংশ সফল তারা। ফলে বৈষ্ণবনগরে জাঁকিয়ে বসেছে এই ব্যবসা।

স্থানীয় বাজারে জাল নোটের কারবার নেই। জাল নোট ক্যারিয়ারদের হাত মারফত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার হয়ে যায়। এলাকার প্রত্যেকেই জানে কে বা কারা এই কারবারে যুক্ত। কোনও প্রতিবাদের স্বর শোনা যায়নি এ পর্যন্ত। বরং জাল নোট পাচারে সহায়তার জন্য শাসকদলের দু'-একজন কর্মী-সমর্থকের নাম উঠে এসেছে। এ দেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ জাল নোটের কারবার হয়, তার ১৫ শতাংশ বৈষ্ণবনগর থেকেই পাচার হয়। বৈষ্ণবনগরে জাল টাকার রমরমা কারবারে উঠে এসেছে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের নাম। এই কারবার রোধ করতে জেলা পুলিশ ও সীমান্তরক্ষীবাহিনী ব্যর্থ। ব্যর্থ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগও। প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে জাল নোটের কারবার কীভাবে এত রমরমিয়ে চলছে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ জাল টাকা পাচার নিয়ন্ত্রণে আনতে কালিয়াচকে একটি অফিস খুলেছে। এসব সত্ত্বেও কিন্তু কারবারিদের দমিয়ে রাখা যায়নি। তারা ক্রমেই জড়িয়ে ফেলছে ছাত্রছাত্রীদের। ক্যারিয়ারদের ৫ হাজার-১০ হাজার টাকা দিয়ে জাল নোট অন্যত্র নিয়ে যেতে উৎসাহিত করছে। কাঁচা টাকার লোভে এ কাজে যুক্ত হচ্ছেন গৃহবধূরাও। এমনকি নাবালক ছেলেমেয়েরাও। কলেজপড়ুয়া এক ক্যারিয়ার সাবির জামান সাফ জানাল, ঘরে টাকা না দিলে হাঁড়ি চড়বে না। সদ্য কৈশোর পেরনো মইনুলের কথা অনুযায়ী, স্কুলে পড়তেই সে এই কাজে জড়িয়ে পড়ে। তার বাবা-মায়েরও সায় আছে এ কাজে। কারণ, তার রোজগারের টাকাতেই সকলের পেট ভরে। মাস ছয়েক এ কাজে হাত পাকানো কালিয়াচকের গৃহবধূ পাপিয়া বৈরাগী জানাল, স্বামীর রোজগার নেই, ঘরে তিনটি সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি— সব মিলিয়ে সাতজন, টাকা ছাড়া কীভাবে ভরবে এতগুলো লোকের পেট?

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মী জানান, জাল নোট পাচার নির্মূল করতে গেলে প্রথমে এলাকার উন্নয়ন ও শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানান কর্মসূচি সরকারের তরফ থেকে নিতে হবে। কেননা যারা জাল নোট পাচারের কাজে গ্রেপ্তার হচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। কেউই প্রায় লেখাপড়া জানে না।

এ তো গেল জাল নোটের অধ্যায়।

'অউর ভি টুইস্ট বাকি হ্যায়'—

বৈষ্ণবনগর থানার সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে বহাল তবিয়তে গজিয়ে উঠেছে বোমা তৈরির কারখানা। দিনের বেলা আমবাগান কিংবা লিচুবাগানগুলির ভিতরে নিয়ম করে চলে বোমা বাঁধার কাজ। বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে বোমা তৈরির কারিগরদের নিয়ে এসে বোমা তৈরির কারবার চালায় এলাকারই সমাজবিরোধীর একাংশ, বলে অভিযোগ। সারাদিন বোমা বেঁধে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা মেলে বলে জানান বিহারের পূর্ণিয়ার এক বোমা কারিগর রামপ্রসাদ পান্ডে (কাল্পনিক নাম)। জৈনপুরের বোমা কারিগর আসাদুজ্জামান, ইসমাইল, নরহরি মণ্ডল, শিবেন (কাল্পনিক নাম) প্রমুখরা জানাল, বোমা কেনে স্থানীয় দুষ্কৃতীরা এলাকায় নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে। তবে ভোটের সময় ডিমান্ড বেশি হয়। চোরা পথে বাংলাদেশের নওগাঁ, কুষ্টিয়া, রাজশাহি, পাবনা জেলায় সরবরাহ করা হয়। বোমা নিতে সীমান্ত পার হয়ে বৈষ্ণবনগরে চলে আসে বাংলাদেশি ক্যারিয়াররা। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ এলাকার এক ক্যারিয়ার আকবর হোসেন বলল, কাঁটাতার পার করে বাংলাদেশে ঢুকতে পারলেই তিন হাজার টাকা পাব। বোমাগুলো বাংলাদেশের ডিলারদের দিই। তারা সেগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় চড়া দামে বিক্রি করে। শুধু বোমা নয়, অর্ডার দিলে মিলবে অত্যাধুনিক অস্ত্র। ৯এমএম, কারবাইন, এলএমজি, একে৪৭ পিস্তলসহ অত্যাধুনিক হাতিয়ারও

সরবরাহ করে বৈষ্ণবনগরের অস্ত্র কারবারিরা।

বৈষ্ণবনগরে যে বোমাগুলো বানানো হয় তা হল বলবোমা। প্লাস্টিক বলের মধ্যে মশলা ঠেসে সেগুলো তৈরি হয়, যা অত্যন্ত শক্তিশালী। এই বোমাগুলো সাধারণত ব্যবহার করে বাংলাদেশের গোষ্ঠী জামাত-ই-ইসলামি ও বাংলা ভাই গোষ্ঠী। রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। কী করে আসছে বৈষ্ণবনগরের সমাজবিরোধীদের হাতে এমন অত্যাধুনিক হাতিয়ার তা নিয়ে জেলা পুলিশ খানিকটা হলেও ধন্দে।

এর উপর রয়েছে গোরু পাচার। কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গোরু পাচার অব্যাহত। কখনও চোরা পথে, আবার কখনও বিএসএফ'দের মাসোহারা দিয়ে গোরু পাচার করে পাচার কারবারিরা। গোরু পাচারকে কেন্দ্র করে এই ব্যবসাও জাঁকিয়ে বসেছে এই এলাকায়। কেবল গোরু পাচার নয়, তার সঙ্গে রয়েছে হেরোইন, ব্রাউন শুগারের মতো মারণ মাদকের ব্যবসা। চোরা পথে এই ধরনের মাদকগুলি বাংলাদেশে পাচার করে কারবারিরা। কোটি টাকা অঙ্কের এই কারবার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এর উপর রয়েছে এলাকায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য। প্রায় নিয়মিত এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে সমাজবিরোধীদের গোষ্ঠীর মধ্যে গুলির লড়াই, বোমাবাজির ঘটনা ঘটতেই থাকে। সম্প্রতি বৈষ্ণবনগরের জৈনপুর গ্রামে গিয়াসুদ্দিন শেখের বাড়িতে রাতে বোমা বানাতে গিয়ে মৃত্যু ও সেই বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে সিআইডি'র বম্ব স্কোয়াডের দুই কর্মীর মৃত্যুতে সন্ত্রাস ছড়িয়েছে এলাকায়। অন্য দিকে, কালিয়াচক-কাণ্ড এখনও ভোলেনি দেশের আমজনতা। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ এক প্রতিবাদ মিছিল থেকে উত্তেজিত জনতা কালিয়াচক থানায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় সরকারি গাড়ি। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি থানার নথিপত্রও পুড়ে যায়। এর পিছনে মদত ছিল কালিয়াচকের সমাজবিরোধীদের। অসামাজিক কাজে গ্রেপ্তার হওয়া অপরাধীদের বাঁচাতেই এই ঘটনা বলে জেলা পুলিশের মত। জেলা পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দোপাধ্যায়ের আশ্বাস, লাগাতার অভিযান চলছে বৈষ্ণবনগরের যাবতীয় ক্রাইম প্রতিরোধ করতে, গোয়েন্দা বিভাগও এ ব্যাপারে তৎপর। কিন্তু এত সহজেই কি জাল নোট, বোমাসহ আগ্নেয়াস্ত্রর বেআইনি কারবার এবং গোরু পাচার বন্ধ করা যাবে?

মানস দাস
ছবি: প্রতিবেদক

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও উত্তর দিনাজপুরে বহাল

বছরে দু'-দু'বার শিশু দিবস পালিত হয় এ দেশে। প্রথমটি নেহরুর জন্মদিনে তাঁর শিশুপ্রীতিকে স্মরণে রেখে জাতীয় স্তরে। দ্বিতীয়টি শিশুদের অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্র অনুসারে আন্তর্জাতিক স্তরে। কিন্তু তাতেও কি শিশুশ্রম বন্ধ করা গিয়েছে? স্পষ্ট উত্তর, একেবারেই না। এমনকি কৈলাস সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাইয়ের শিশুর অধিকার নিয়ে লড়াইকে নোবেল কমিটির স্বীকৃতিদানের পরও না। শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও উত্তর দিনাজপুর জেলার হোটেল, রেস্তরাঁ কিংবা বাড়ির পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে ১৪ বছরের কমবয়সি অগুনতি শিশু। আইন প্রণয়নের কোনও প্রভাব যে জেলায় পড়েনি তা জেলার সামগ্রিক চিত্রেই পরিষ্কার।

যে বয়সে নয়না কামাত, সুরজ সিংদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বই, সেই বয়সে পেটের খিদে মেটাতে ওরা হাতে তুলে নিয়েছে মাটি, জলের জগ। লোকের বাড়িতে বছর আটেকের এক শিশু স্পষ্টতই জানিয়ে দিল, লেখাপড়ার ইচ্ছে থাকলেও ওই স্বপ্ন দেখা তার কাছে অবাস্তব। কেননা অভাবের সংসারে যেখানে দু'বেলা পেটের ভাত জোগাড় করাই দুষ্কর, সেখানে পড়াশোনার খরচ আসবে কোথা থেকে! হোটেলে টেবিল পরিষ্কার করে এবং বাসনপত্র ধুয়ে দু'বেলা খাবার মেলে সুরজ সিঙের। বছর দশেকের কিশোর সুরজ জানে না যে, তারা পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনও কাজ করতে পারবে না। সুরজ জানাল, বাড়িতে জোটে না খাবার, তাই হোটেলে কাজ করে খাবার জোগাড় করতে হয়। রায়গঞ্জের এক হোটেলের মালিকই জানিয়েছেন, অভাবের তাড়নায় এইসব শিশু কাজ করতে আসে হোটেলগুলিতে। তার দাবি, হোটেলে কাজ করতে আসা শিশুরা কেউই স্থায়ী নয়। ফলে নথিভুক্ত শিশুশ্রমিক প্রমাণ করাও দুষ্কর। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, আইন প্রণয়ন করে শিশুশ্রমিক বন্ধ করা হলেও আজ তা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে।

জেলার সহকারী শ্রম কমিশনার জানিয়েছেন, শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ আসার পরই তা বাস্তবায়িত করার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। তৈরি করা হচ্ছে শিশুশ্রমিকের তালিকা। এই মুহূর্তে জেলার বিপজ্জনক শিল্পে কর্মরত রয়েছে ৭,৩০০ জন শিশু এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৮৬৮। শ্রম দপ্তরের দেওয়া ব্লকভিত্তিক শিশুশ্রমিকের সংখ্যার পরিসংখ্যান অনুযায়ী রায়গঞ্জ ব্লকে বিপজ্জনক শিল্পে কর্মরত রয়েছে ৪৩৬ জন। কালিয়াগঞ্জ ব্লকে বিপজ্জনক শিল্পে ৫২৯ জন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৬২৫ জন। ইটাহারের ৩২১ ও ৮৪৮৩ জন, ইসলামপুরে ২২ ও ২৩৬ জন, চোপড়ায় ৬৯ ও ৪০৫ জন, গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকে ৮৯০ ও ১১৫৩ জন, গোয়ালপোখর ২ নম্বর ব্লকে ৩১০ ও ১২০৩ জন এবং সবচেয়ে বেশি শিশুশ্রমিক রয়েছে করণদিঘি ব্লকে, যেখানে বিপজ্জনক শিল্প বিড়ি বাঁধার কাজে নিযুক্ত রয়েছে ৪৯৪০ জন শিশু এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে ১১৯২৫ জন শিশু।

আইন প্রণয়নের পরেও যেসব হোটেল, রেস্তরাঁ কিংবা গ্যারেজগুলিতে শিশুদের কাজে নিয়োগ করা হবে, সেসব সংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জেলার সহকারী শ্রম কমিশনার জানিয়েছেন। শ্রম দপ্তর কড়া পদক্ষেপ নিলেও উত্তর দিনাজপুর জেলায় শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে।

তন্ময় চক্রবর্তী

দেবপ্রসাদ রায়

জীবনধারাভাষ্যে কলকাতা কিংবা ডুয়ার্সের সমাজজীবনের ছবির পাশাপাশি এসে পড়ে পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধকালীন এ দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ওই বঙ্গে যুদ্ধ শুরুর দশ মাসের মাথায় কলাইকুন্ডা সেনা বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলে পাকিস্তান। সে দিন আবার ইন্দিরা গান্ধি কলকাতার ব্রিগেডে সভা করছিলেন। সেই সভা থেকেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ওপার থেকে প্রতিদিন শরণার্থীরা আসতে শুরু করে এপারে। বেড়ে যাচ্ছিল শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা। ওপার বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এপারের মানুষের মনে একটা আবেগের জন্ম দিয়েছিল। ‘তরুণ আহ্বান’-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রদর্শনী থেকে শুরু করে কলকাতার বসুশ্রী সিনেমা হলে মুক্তিযোদ্ধা বাঘা সিদ্দিকির সংবর্ধনাসহ আরও বহু ঘটনার কথা উঠে এসেছে এই পর্বে।

১২

খবর পাওয়া গেল যে, জলপাইগুড়ির একজনের বেশ ভাল ব্যবসা আছে কলকাতায়। পাম্পের ব্যবসা। বিই পাম্প। ভদ্রলোকের নাম বি নাহা। থাকতেন যাদবপুরে। আর এন মুখার্জি রোডে চমৎকার সাজানো-গোছানো অফিস। বড়দের কেউ একজন ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। আমরা চারমূর্তি তখনও কলকাতায়। অফিসে যেতেই তিনি বললেন, ‘আইছস? আয় আয়! বস।’

বেশ খাতির করেই বসালেন আমাদের। আমি লক্ষ করলাম অফিস ঝকঝকে করে সাজানো। কিন্তু বেমানান হয়ে একটা গামছাও ঝুলছে। বাধ্য হয়ে জানতে চাইলাম, গামছা কেন ঝুলছে? তিনি বললেন, ‘তরা কয়জন?’

‘এই চারজনই।’

‘অ। আর কয়িস না। এইর’ম অশান্তি সর্বত্রই। তা সাহায্য তো করুম। হেইটা তো ব্যাপার না। তা এক কাজ কর ত! ইস্ট রোডে আমার একখান বাড়ি আসে। চারজন গিয়া থাক। হেই শালা নকশালদের কারণে আমারে অফিসে থাকতে হইতাসে!’

গামছার রহস্য বোঝা গেল।

‘লাঠিসোঁটা আসে না তদের কাসে?’

জানালাম যে আপাতত নেই।

‘অসুবিধা নাই। সব জোগাড় কইরা দিব। দশটার মধ্যে খায়েদায়ে লাঠি লইয়া অগুলারে বেশ কইরা কয় ঘা লাগায় দিবি ত। শুয়োরের বাস্যাগুলি আমারে বাসায় ঢুকতে দিস্যে না!’

হায়! আমরাও তখন একই ভয়ে বাড়িছাড়া। আর আমাদের দিয়েই উনি কিনা নকশাল তাড়াতে চান! সে বাড়ির ঠিকানা আজও আমার মনে আছে। ৬ নং ইস্ট রোড। যাদবপুর।

এইভাবে বারোশো টাকার মতো জোগাড় হল। তখন আমাদের দলের রাজ্যস্তরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সোমেনদা। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য আমরা তাঁর দ্বারস্থ হলাম। তিনি যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। আমাদের হাতে এল পাঁচটা পাইপগান আর থ্রি নট থ্রি রাইফেলের পঞ্চাশটা কার্তুজ। সেই রসদ নিয়ে আমি আর শেখর রওনা দিলাম জলপাইগুড়ির দিকে। ততদিনে মাস দেড়েক কলকাতায় কাটানো হয়ে গিয়েছে।

কী একটা বন্যার কারণে দার্জিলিং মেল তখন সরাসরি জলপাইগুড়ি যাচ্ছিল না। ফারাক্কা ব্রিজও তখন চালু হয়নি। ফলে শোনপুর ইত্যাদি হয়ে ট্রেন যাচ্ছিল অনেক ঘুরপথে। শিয়ালদার বদলে ছাড়ছিল হাওড়া থেকে। হাওড়া প্ল্যাটফর্মে আমি আর শেখর দাঁড়িয়ে আছি। দু’জনের হাতে দুটো করে ব্যাগ। ওতে আমাদের ‘রসদ’। আমার কাছে তিনটে আর শেখরের কাছে দুটো। কার্তুজও ভাগ করে ভরে নিয়েছি নিজেদের ব্যাগে। সরাসরি টিকিট পাইনি। সমস্তিপুর পর্যন্ত টিকিট কাটার পর পকেটে টাকা খুব কম। সমস্তিপুর থেকে টিকিট কাটতে হত আবার। সেখান থেকে কাটিহার। আবার টিকিট কেটে বারসৈ। সেখান থেকে এনজেপি।

স্টেশনে শেখর হঠাৎ বলল, ‘মিঠুদা! দেখো কে?’

দেখলাম একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন নকশালদের একজন বড় নেতা নিখিলেশ দত্ত। তিনি ছিলেন তখন ত্রাস সৃষ্টিকারী নকশাল নেতা। আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা যাচ্ছ এই ট্রেনে?'

বললাম, 'যাচ্ছি।'

'চলো। আমিও যাচ্ছি।'

শুনে গলা শুকিয়ে গেল। শেষে আমাদের দু'জনের ঠাঁই হল একটা মিলিটারি কম্পার্টমেন্টে। নিখিলেশ দত্ত গেলেন অন্য কামরায়। এবার আমরা সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়লাম। ট্রেন থেকে নামলে নিখিলেশ দত্তর ভয়। থাকলে মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়ার ভয়। এর সঙ্গে মাত্র অল্প কিছু তহবিল থাকার টেনশন! সমস্তিপুরে অবশ্য কলেজের বান্ধবী অর্পিতা আর সুস্মিতার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কুড়ি টাকার মতো ধার পাওয়া গেল।

সমস্তিপুরে টিকিট কাউন্টারের হদিশ না পেয়ে আমরা টিকিট না কেটেই কাটিহারগামী একটা ট্রেন পেয়ে উঠে পড়লাম। যথাকালে টিটিই এলেন। আমরা হাওড়া থেকে কাটা টিকিট দেখিয়ে বললাম সেটাকে এক্সটেন্ড করে দিতে। উনি গম্ভীরভাবে জানালেন, 'অসম্ভব! আপনার ডব্লিউ টি হয়ে গিয়েছে।'

ব্যাপারটা যে তা নয়, সে কথা উনি মানতেই চাইলেন না। আমাদের নামিয়ে দিলেন কাটিহারে। তারপর একটা মালগাড়ির আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কত আছে দিন।'

পকেট হাতড়ে বার হল তেইশ টাকা। উনি তা থেকে কুড়ি টাকা নিয়ে চলে গেলেন।

অবশিষ্ট তিন টাকায় দু'জনের ভাত হবে না। দু'টাকা দিয়ে রেলওয়ে ক্যান্টিন থেকে শেখরকে মিল সিস্টেমে ভাত খাইয়ে আমি এক টাকার পুরি খেলাম। টিকিট কাউন্টার দেখা গেলেও এবার বাধ্যতামূলক বিনা টিকিট। ফাঁকা পকেটে অবশ্য একটা স্বস্তি কাজ করছিল। কারণ, নিখিলেশ দত্তর হাত থেকে বাঁচা গিয়েছে। ঘুষখোর টিটিই তাঁর ট্রেন নিয়ে চলে গিয়েছেন। ট্রেন নিয়ে গিয়েছে নিখিলেশ দত্তকে।

বারসৈ এসে জানা গেল, মাঝরাতে রাধিকাপুর প্যাসেঞ্জার আসবে, আর সেটা যাবে রায়গঞ্জ। সেটা ধরাই ঠিক হল। আমরা প্ল্যাটফর্মে গামছা পেতে শুয়ে থাকলাম। ট্রেন এল রাত তিনটেয়। সকাল ছ'টা নাগাদ আমরা নামলাম রায়গঞ্জে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিকশা নিয়ে চললাম শংকর চক্রবর্তীর বাড়ির দিকে। রিকশা ভাড়া শংকর দেবে। ওর বাড়ি মোহনবাটির দিকে রিকশা যাচ্ছে। আচমকা নজরে এল, একটা হোটেলের বারান্দায় শংকর দাঁড়িয়ে। ও আমাদের দেখতে পেয়েছিল। চিৎকার করে ডাকল, 'এই মিঠু! কই যাস?'

রিকশা দাঁড় করিয়ে বললাম, 'শংকর, তুই এখানে?'

'এখানেই তো থাকি।'

'তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।'

'আয় আয়!'

শংকর রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিল। আমরা হোটেলে ওর ঘরে এসে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই হোটেলে কেন রে শংকর?'

'আরে, পাড়ায় থাকতে পারতেসি না তো নকশালদের যন্ত্রণায়!'

কিছুই বলার ছিল না। আমরা চা, টোস্ট, মামলেট খেয়ে, স্নান করে সতেজ হলাম। কিন্তু শংকরকে আমি বিলক্ষণ চিনি। একটু জিরিয়ে নিয়ে ব্যাগগুলো খুললাম। ঠিক যা ভেবেছি তা-ই! পাঁচটার মধ্যে একটা হাওয়া! বাধ্য হয়ে বললাম, 'শংকর! আরেকটা পাইপগান কই?'

পাইপগান পাঁচটা ছিল তখনকার বিচারে অত্যাধুনিক। লক সিস্টেম ছিল। গুলি ভরে লক করে রাখা যেত। শংকর তাই ফেরত দিতে চাইল না। বলল, 'একটা রাখি না! বাড়ি ফিরতে পারতেসি না। একটা লাগবেই!'

অতিকষ্টে পাইপগান উদ্ধার হল। এর মধ্যে বালুরঘাট থেকে মলয় গুপ্ত চলে এসেছে গাড়ি নিয়ে। সে যাচ্ছিল ইসলামপুরে গৌতম গুপ্তর কাছে। কাজেই আমরা ওর গাড়িতে চাপলাম। ইসলামপুরে দেড় দিন কাটিয়ে স্টেট ট্রান্সপোর্টের পাস জোগাড় করা গেল শিলিগুড়ি অবধি।

জলপাইগুড়ি ফেরামাত্র শম্ভুদা লোক পাঠিয়ে দু'খানা পাইপগান নিয়ে গেলেন। এ খবর তাঁর কাছে আগেই পৌঁছেছিল। শম্ভুদার বক্তব্য, 'এসব দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর ঘাড়েই। তাই তাঁর কাছেই তো থাকা উচিত এসব।'

পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি এলাকার জন্য একটা দেওয়া হল তেজেনদাকে। তিনিই তো সেখানে যুদ্ধ সামলাতেন। পরে পাইপগানের রিপোর্ট দিতে এসে তেজেনদা বললেন, 'বুঝলা মিঠু! সাংঘাতিক জিনিস। আমি তো সুপারি গাছের দিকে তাক কইরা একবার চালাইলাম। ধিড়িম!'

পাশ থেকে ছানুদা বললেন, 'তেজেনদার হাতে অস্ত্র যাওয়ার পর কিন্তু তোরলপাড়ার দিকে ডাকাতি খুব বেড়ে গিয়েছে!'

এইসব টেনশনের কালে একদিন শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই দেখলাম, পরিস্থিতি অদ্ভুতভাবে বদলাতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে ওই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ। এপ্রিল-মে থেকেই শরণার্থীরা আসতে শুরু করল এই রাজ্যে। পয়লা বৈশাখে আমরা একটা প্রভাতফেরি করেছিলাম বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে। ততদিনে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে গিয়ে আমরা শরণার্থীদের অনুরোধ করতাম সুস্থ সবল ছেলেদের বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে গঠিত মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য। শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। সরকার তখন 'শিবির কর্মচারী' হিসেবে অনেক ছেলে নিয়োগ করেছিল রাজ্যে। কাজের কারণে নকশালবাহিনী থেকে অনেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল বলে আমার ধারণা। ফলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নকশালদের আধিপত্য বেশ খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এ রাজ্যের মানুষের মনে একটা আবেগের জন্ম দেয়। অংশুমান রায়ের বিখ্যাত গানটা তখনই রেকর্ডে বেরিয়েছিল— 'শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠে/ লক্ষ মুজিবরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি/ আকাশে বাতাসে উঠে রণি/ বাংলাদেশ/ আমরা বাংলা রে!' দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় রেডিয়োতে যুদ্ধের শিহরন জাগানো বিবরণের কথাও মনে আছে। বাংলাদেশে যুদ্ধ শুরুর দশ মাসের মাথায় কলাইকুন্ডা সেনা বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেলল পাকিস্তান। সে দিন ইন্দিরাজি তখন কলকাতায় ব্রিগেডে সভা করছিলেন। সেই সভা থেকেই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেটা হল ১৯৭১-এর ৪ ডিসেম্বর। কুড়ি দিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ। ২৪ তারিখে পাকিস্তানের কর্নেল নিয়াজি ছিয়াশি হাজার সেনা নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার কাছে। অরোরাজি পরে আমার সঙ্গে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন।

এসব ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ায় রাজ্য নকশাল আন্দোলন অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে ততদিনে। অবশ্য প্রশাসনও শক্ত হাতে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ তখন রাজ্যের মানুষের কাছে নতুন আবেগ, নতুন স্বপ্ন, নতুন ভালবাসা। মনে আছে, হেদুয়া পার্কের কাছে কলকাতায় প্রণব (টিলটিল) ঘোষের সংগঠন 'তরুণের আহ্বান' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা চিত্র প্রদর্শনী করেছিল। সময়টা শীতকাল, জানুয়ারি মাস হবে। সেখানে আবার কলকাতার মানুষের সামনে প্রথম বক্তৃতা। গায়ে লং কোট, মুখে হালকা দাড়ি। বক্তব্য রাখার পর বহু মানুষ আমাকে বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা ভেবে অভিনন্দন জানাতে থাকে।

পরবর্তীতে প্রিয়দার উদ্যোগে আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বাঘা সিদ্দিকিকে বসুশ্রী সিনেমা হলে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন প্রিয়দা।

(ক্রমশ)

উত্তর তরঙ্গ

২৭

জলধক্কা নদীর উত্তর-পশ্চিম পাড় ধরে উত্তর মুখে জনাকয়েক বিশ্বস্ত সঙ্গী আর শুকনো খাবার নিয়ে তারিণী বসুনিয়া রামশাই লাগোয়া অরণ্যে কিছুদিন থাকার পর জলপাইগুড়ি এসেছিলেন খবর সংগ্রহের জন্য। হাতি দিয়ে তাঁর ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন পুলিশ এবারের মতো থামবে। কিন্তু থামেনি। রামশাইতে তাঁর ডেরা পর্যন্ত এখনও ধাওয়া না করলেও, তারিণী বসুনিয়া টের পেয়েছেন যে, সে ডেরা ভবিষ্যতে আর নিরাপদ থাকছে না। জলপাইগুড়ি টাউনে অসহযোগ আন্দোলনের দাপট বেড়েই চলেছে। গোটা দেশেই এক অবস্থা। টাউনের প্রথম সারির নেতারা বেশির ভাগ জেলে, নয়ত পলাতক। তারিণী বসুনিয়া নিজেও ছিলেন পলাতকের তালিকায়। কিন্তু আন্দোলনের তেজ না কমায় ব্রিটিশরা এখন ঠিক করেছে পলাতকদের খুঁজে খুঁজে জেলে ভরবে। ব্যাপারটা কতটা সত্যি তা জানিয়ে যাওয়ার কথা ছিল একজনের। কিন্তু সে আসছে না দেখে তিনি নিজেই একটু ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি। জেনেছিলেন যে খবর পাক্কা।

ফিরে এসেই আর দেরি করেননি তারিণী বসুনিয়া। আশপাশের গ্রাম থেকে রসদ জোগাড় করে জলধক্কার মূলস্রোত ধরে কিছুটা উত্তরে গভীর অরণ্যের মধ্যে চলে যেতে শুরু করেন। একটা শাখানদী ধরে এই মুহূর্তে তিনি উত্তর-পশ্চিম বরাবর চলছিলেন। শীতের অরণ্য মধ্যাহ্নেও হালকা কুয়াশায় কিছুটা অস্পষ্ট। বিশাল বৃক্ষরাজি আর অজস্র গাছে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হলেও তাঁরা চলছিলেন বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হওয়া একটা গুপ্ত পথ ধরে। ডুয়ার্সের অরণ্যের ভিতরে এই ধরনের গুপ্ত পথগুলি আসলে ভুটানি সেনারা ব্যবহার করত। তারিণী বসুনিয়া এইরকম গুপ্ত পথের কয়েকটা চেনেন। সোজা ভুটানে চলে যাওয়া যাবে সেসব পথে। কিন্তু পাশাপাশি দু'জন যাওয়াই কঠিন সে পথে। ঘোড়া নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তারিণী বসুনিয়ার লোকেরা তাই হাঁটছিল সারি বেঁধে। লোকগুলো প্রত্যেকেই রাজবংশী এবং অতি বিশ্বস্ত। এ ছাড়াও এদের প্রত্যেকেই দক্ষ যোদ্ধা। গারালু বলে একজন ব্যাপারটা

বোঝাচ্ছিলেন। গারালুর বয়স চল্লিশ-পয়ঁতাল্লিশ। তাঁর হাতে একটা বাংকুয়া। বাঁশের তৈরি এই বস্তুটা ভার বইবার কাজে ব্যবহৃত হলেও গারালুর কাছে এটা একটা অস্ত্রবিশেষ। বাঁশের লম্বা টুকরোটিকে সে যখন ঘোরায়, তখন বাতাসে বোঁ বোঁ শব্দ ওঠে। বাকিরা তরোয়াল, বল্লম, বন্দুক ব্যবহার করলেও গারালু ওসব ছুঁয়ে দেখেনি কোনও দিন। তার একমাত্র দুর্বলতা হল শিব ঠাকুর। জল্পেশ মন্দিরের গল্প তাই সে শুনেছিল মন দিয়ে।

গল্পে গল্পে ভুটানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের কথাটাও এল। তারিণী বসুনিয়া বলছিলেন, আর মনে মনে অনুমান করছিলেন যে, ডেরা বাঁধার নতুন জায়গাটা আর দূরে নেই। একটা ছোট স্রোত এসে নদীতে মিশেছে। সেটা পেরলেই বাঁ দিকে ছোট উঠোনের মতো একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে গাছের উপর দুটো বড় মাচা বাঁধা আছে। ভুটানি সেনারা গাছ কেটে ফাঁকা জায়গাটা বার করেছিল। তারিণী বসুনিয়া কয়েক বছর আগে এসেছিলেন মাচায় বসে বাঘ মারার জন্য। তখন ঝোপজঙ্গল কাটিয়ে ফাঁকা জমিটাকে সাফসুতরো করে নিয়েছিলেন, কিন্তু ছাগলের টোপ দেওয়া সত্ত্বেও সেবার বাঘ আসেনি।

'পুরানাং জানা যাছে দক্ষযজ্ঞৎ সতী দ্যাহত্তেগ করিল। উয়ার দেহাটাক কাঙৎ ফেলায়া শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করিল। উয়ায় রুদ্রমূর্তি ধরিয়া তামান পৃথিবী ভরমিবার ধরিলে পৃথিবী ধ্বংস অয় অয় অবস্থার

> রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে তারিণী বসুনিয়ার মনে পড়ে গেল উপেনের কথা। তিনি হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়লেন। উপেনের দেওয়া দেশলাই বাক্সের চিরকুটে হিদারুর উদ্দেশে কী লেখা ছিল তা তিনি জানতেন। সব কিছু ঠিকমতো চললে উপেন এখন আলিপুরদুয়ারে। সেখানে একটা ডেরার ব্যবস্থা তারিণী করে দিতে পেরেছেন। কিন্তু এর বেশি কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এখন তো প্রশ্নই নেই।

কাথা চিন্তা করিয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়া সতীর দেহাটা ঠুমা ঠুমা করিয়া নানান জাগাৎ ফেলে দিলেন। হামার জল্পেশৎ পড়িল সতীর ন্যাড়া ঠ্যাং-এর পাতা।'

এই পর্যন্ত বেশ নাটকীয়ভাবে বলে তারিণী বসুনিয়া গারালুকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, কীভাবে ভুটানিদের হাত থেকে ইংরেজরা জল্পেশকে নিয়ে নিল। কিন্তু সে কাহিনি একটু এগতেই গল্প থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। স্রোতটা সামনে দেখা যাচ্ছে। তার মানে জায়গাটা এসে গিয়েছে। গারালুর চোখেও পড়েছে সেটা। সে বাংকুয়াটা বাড়িয়ে বলল, 'অঁয়, অঁ-য়, দেখিসনে?'

দলটা দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। খুঁজে পেতে দেরি হল না মাচা দুটো। তবে জমিতে এক কোমর ঝোপের জঙ্গল। গারালুর নির্দেশে দলটা এবার কাজে লেগে পড়ল। ঘণ্টা দুয়েক পর একটু দূরে নদীর জলে যখন বিকেলের আলো চিকচিক করছে, তখন দেখা গেল জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ শেষ। তারিণী নদীর কনকনে জলে স্নান করে দড়ি ধরে গাছের ডালে উঠলেন। দুটো মাচাই বেশ বড়। অপেক্ষাকৃত বড় মাচার এক কোণে তারিণীর জন্য আলাদা করা হয়েছে মাদুর পেতে। সেখানে বসে চিঁড়ে আর গুড় খেলেন তিনি। এই খেয়েই দিন দুয়েক কাটাতে হবে। ভাত না জুটলেও খাদ্যের অভাব হওয়ার কথা নয়। শিকারের অভাব নেই এই অরণ্যে। সেটা মাথায় রেখেই তিনি খাওয়া শেষ করে বসলেন বন্দুক পরিষ্কার করতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাজারে আসা এই রাইফেলটা তিনি কিনেছিলেন টাউন থেকে। দারুণ জিনিস।

কিন্তু রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে তারিণী বসুনিয়ার মনে পড়ে গেল উপেনের কথা। তিনি হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়লেন। উপেনের দেওয়া দেশলাই বাক্সের চিরকুটে হিদারুর উদ্দেশে কী লেখা ছিল তা তিনি জানতেন। সব কিছু ঠিকমতো চললে উপেন এখন আলিপুরদুয়ারে। সেখানে একটা ডেরার ব্যবস্থা তারিণী করে দিতে পেরেছেন। কিন্তু এর বেশি কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এখন তো প্রশ্নই নেই। ক'দিন এই মাচায় দিন কাটাতে হয় কে জানে! অবশ্য তারিণী নিজে এ নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। বরং এমন উত্তেজনাপূর্ণ জীবন মাঝে মাঝে কাটাতে না পারলে তাঁর একঘেয়ে লাগে।

রাইফেলটা সরিয়ে রেখে তারিণী বসুনিয়া একবার বাইরে তাকালেন। আলো প্রায় চলে গিয়েছে। আকাশ ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশায়। আর একটু পরেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নামবে। বেশ শীত লাগছিল তারিণী বসুনিয়ার। তিনি পাশে রাখা পাত্র থেকে একটা গুয়া সুপারি তুলে মুখে দিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। এই সুপারি শরীরকে গরম রাখবে। আবছায়া ক্রমে গাঢ় হতে হতে এক সময় নিকষ অন্ধকারে পরিণত হয়। দৃশ্যপট মুছে গিয়ে পড়ে থাকে কেবল কালোর প্রলেপ। অকস্মাৎ সেই প্রলেপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে উজ্জ্বল আলোয়। কাল গড়িয়ে যায় অতীত থেকে বর্তমানে। তারিণী বসুনিয়ার মাচার চারপাশে হাওয়ায় ভেসে আসতে থাকে গোরুমারা পর্যটনকেন্দ্রে সমবেত পর্যটকের গুঞ্জন। জঙ্গল সাফারির গাড়ি যেন ছায়ার মতো পাক নিয়ে যায় উঠোনের মতো ফাঁকা অংশটিকে। তেমন একটা গাড়িতে আমি আবিষ্কার করি নিজেকে। দেখি, গাড়ির পাশে আলোর শরীর নিয়ে ভেসে যাচ্ছে ডুয়ার্সের হরিদ্রাভ আত্মা।

তিনি আমাকে দেখে মৃদু হাসেন।

তাঁকে কেবল দেখি আমি।

'তারিণীবাবুর লুকিয়ে থাকার জায়গাটা তবে সাফারির রাস্তা থেকে দূরে নয়? আমি জানতে চাই।

হরিদ্রাভ আত্মা তেমনই হাসেন। তারপর বলেন, 'না, তা নয়। মূর্তি নদীর পাড় ধরে তিনি এসেছিলেন এই অরণ্যে। তখন এই গোরুমারা এক অসীম বিপিন।'

এই পর্যন্তই। কাল আবার পিছিয়ে চলে যায় হিদারু-উপেনের যুগে। পর্যটকের দল মিলিয়ে যায় ভবিষ্যৎ হয়ে। লাটাগুড়ি থেকে তারিণীর আশ্রয় পুনরায় হয়ে ওঠে দুর্গম, রহস্যময়। নিশিথ অরণ্য থেকে ভেসে আসতে থাকে বিচিত্র শব্দবাজি। আকাশ আর অরণ্যের মধ্যবর্তী সব কিছু যেন ডুবে যায় শীতের প্রলেপ মাখা গভীরতর কুয়াশায়। কেবল একটি অতি সূক্ষ্ম আলোর আভাস জেগে থাকে। সে আলো মোমবাতির। মাচার কোনায় মোমবাতি জ্বালিয়ে উপেনকে চিঠি লিখতে বসেছেন তারিণী বসুনিয়া। চিঠিটা তাঁর হাতে যে পৌঁছাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। তবুও লিখছেন। ইংরেজের পুলিশ রথের হাটে তারিণীর বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গান্ধিজির কথা মাথায় রেখে একবার তাদের ক্ষমা করেছেন তারিণী। কিন্তু আবার যদি বাড়িতে তাঁর পরিবারের ক্ষতি করতে পুলিশের লোক হাতি নিয়ে আসে, তবে তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না। ডুয়ার্সে অনেক চা-বাগান বানাতে গিয়ে রেল লাইন পেতেছে ইংরেজরা অনেক বছর হল। এই জঙ্গল থেকে উত্তরে সোজা এগলে সে লাইন পাওয়া যায়। তারিণী ঠিক করেছেন যে, ইংরেজরা আবার তাঁর বাড়িতে হামলা চালালে তিনি সে লাইন উপড়ে ফেলবেন। উপেনকে তিনি এই ব্যাপারটাই লিখছিলেন।

উপেনও পারে আলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি রেল লাইন আর টেলিগ্রাম পোস্ট উপড়ে দিয়ে ইংরেজদের একটা ধাক্কা দিতে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: সুবল সরকার

লাল চন্দন নীল ছবি

অরণ্য মিত্র

সুষমার দেওয়া ট্যাবলেটটা খাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে মনামির শরীর ও মনে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। সর্বাঙ্গে আশ্চর্য লাস্য তুলে মনামি বিছানায় বসে একটা বালিশ টেনে নিয়ে হেলান দিল। এর পর যেন সে ধাপে ধাপে উঠতে শুরু করল স্বর্গসুখে। সেই স্বর্গের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্য ডুবে গেল অনির্বচনীয় সুখানুভূতির সমুদ্রে। যখন সে ফিরে এল, তখন দেখল তার নগ্ন শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। অন্য দিকে সুষমা ক্যামেরার ডিসপ্লে দেখছে মুগ্ধ চোখে। হোমমেড ব্লু ফিল্মের নেক্সট প্রজেক্টের জন্য তৈরি হয়ে আছে ফুলিয়া। নতুন, কিন্তু বিজনেস দেবে ভাল।

৩৪

পাঁপড় কারখানার মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মুনমুন টোপ্পো পাকাপাকিভাবে ঘরে ফিরে এসেছে দিন দুয়েক আগে। বিজু প্রসাদ কাজ সারতে সময় নেয় না। লোক পাঠিয়ে মালিকের সঙ্গে রফা করে মুনমুনকে 'রিলিজ' করিয়ে নিয়েছে। বদলে অবশ্য মালিককে দিয়েছে একটা কমবয়সি ডবকা মেয়ে। বাংলাদেশ থেকে শেষ যে দলটাকে এ দেশে ঢোকানো হয়েছে, তার সর্বশেষ সদস্যা। মালিকের আবার অবাঙালি মেয়ের প্রতি একটু বেশিই 'টান' রয়েছে। এমনিতে সে পুজো না করে কাজে হাত দেয় না, এবং নিজের জাতগৌরব নিয়ে অহংকার করে। কিন্তু বিছানায় আবার জাত কী? শুধু মেয়েটাকে বলে দিয়েছে যে, সে যেন নিজেকে হিন্দু বলে।

ব্লু ফিল্মের জন্য মেয়ে খোঁজার ব্যাপারে বিজু প্রসাদের সঙ্গে কথা হয়ে যাওয়ার পরেই মুনমুন কাজে নেমে গিয়েছিল। ফুলিয়া নামের একটি মেয়েকে সে অনেকটা রাজিও করিয়ে রেখেছে। মেয়েটা পাশের বাগানের, তবে টাকা রোজগারের খুব ইচ্ছে। সোজা রাস্তায় টাকা কামাতেও তার আপত্তি নেই, কিন্তু রাস্তা পাচ্ছে না। নিজের এলাকায় এসব করা সম্ভব নয় ফুলিয়ার পক্ষে। টাউনে কিছু ব্যবস্থা হলে তার আপত্তি নেই। তবে ক্যামেরার সামনে করতে হবে শুনে একটু দোটানায় আছে। মুনমুন সেটা দূর করার জন্যই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল আজ। নিজের বাড়ি থেকে একটু তফাতে একটা ঢালু জমির ধারে বসে ফুলিয়াকে বোঝাচ্ছিল ভিডিয়ো হলে তার কী কী সুবিধা হবে। প্রথম দিকে যে ভিডিয়ো তোলা হবে, সেগুলো হল হোমমেড। একটা ঘরের মধ্যে কোথাও ক্যামেরা রেখে দিয়ে নায়ক-নায়িকা নিজেদের কাজ করতে থাকে। বড়জোর একজন থাকে ক্যামেরা নিয়ে। ছবি মোটামুটি স্পষ্ট থাকলেই হল। গোড়ার দিকে না হয় মুনমুন নিজেই ক্যামেরা ধরবে। এমন তো কিছু ক্যামেরাওয়ালা লাগে না এসব তুলতে! তবে সেটা চাইলেই শুরু করা যাবে না। তার আগে ফুলিয়ার পিছনে খরচা আছে। ভাল ভাল খাবার আর ওষুধ খেয়ে চেহারাটা একটু ভাল করতে হবে। সাফসুতরো হওয়ার ব্যাপারও আছে। ক্যামেরায় ন্যাংটো ফুলিয়ার ঘাড়ে, কনুইতে মাটি জমে আছে, সেটা দেখতে ভাল লাগবে না মোটেই। তারপর নায়ক জোগাড়ের ব্যাপার আছে। বিজু প্রসাদ বলেছে, শিলিগুড়িতে এমন অনেক নায়ক আছে। নবীন রাই বলে একজনের মাধ্যমে তাদের কয়েকজনকে পাওয়া যাবে। ভিডিয়োর কাজে ঠকে যাওয়ার ভয় নেই। টাকা তো মিলবেই, কাজ ভাল হলে আর ঘুরে তাকাতে হবে না। শাঁসালো খদ্দের এমনিই জুটবে।

ফুলিয়ার দ্বন্দ্ব কেটে যাচ্ছিল এসব শুনতে শুনতে। এমনিতে তার ভবিষ্যৎ বলতে দু'-তিন বছরের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়া। মরদ একটা জুটবে। বড়জোর দু'বেলা

খাওয়াবে। রাতের বেলা রেপ করবে। মাঝে মাঝে সোহাগও করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ময়লা শাড়ি-জামা পরে ঘরের খাটনি খেটেই জীবন কাটাতে হবে তাকে। সিনেমা-সিরিয়ালের মেয়েদের মতো জামা-জুতো-ব্যাগ- মোবাইল-গয়না-শাড়ির কোনও আশা নেই। তার চাইতে শরীর বেচে দিলে অনেক কিছু জুটবে। টাউনে বাড়ি নিয়ে থাকবে ফুলিয়া। অনেক টাকা জমাবে। কাউকে দেবে না।

তাই সে জানতে চায় যে, ছবি তোলা হবে কোথায়। বাইরে গেলে বাড়ির লোক আস্ত রাখবে না। বাইরে যদি যেতেই হয় তো একবারেই বাড়ি ছাড়বে সে। মুনমুন টোপ্পো কথাটা শুনে খুশি হয়। মালদায় ফুলিয়ার মতো নবিশদের চকচকে করে তোলার জন্য একটা ডেরা আছে। বিজু প্রসাদকে জানালেই সে ফুলিয়াকে সেখানে পাঠিয়ে দেবে। শিলিগুড়ি, মালদা— এগুলো বড় শহর। 'হোমমেড' শুটিং-এর কাজ সেখানে সহজেই করা যায়। দু'জায়গাতেই বেশ কিছু বাড়ি আর ফ্ল্যাট আছে। কয়েক ঘণ্টার জন্য ঢুকে পড়লেই হল।

মালদায় যাওয়ার কথা শুনে ফুলিয়া জানতে চাইল যে, সেখানে কী ধরনের ট্রেনিং নিতে হয়। মুনমুন তাকে বোঝায় যে, ক্যামেরার সামনে পুতুলের মতো বিছানায় ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকলে ব্যাপারটা ভাল দেখায় না। মুখে-চোখে নানা ভঙ্গি করতে হবে। একে বলে 'এক্সপ্রেশন'। এটা রপ্ত করতে পারলে ভিডিয়োতে লাইক পড়বে বেশি। রেটিংও বাড়বে। এ ছাড়াও কিছু ব্যায়াম শিখতে হবে। 'পজিশন' শিখতে পারলে রেট বাড়বে। কয়েকটা খারাপ খারাপ কথা ইংরেজিতে মুখস্থ করতে হবে। কাজের সময় কায়দা করে কথাগুলো বললে ভিডিয়ো জমে ক্ষীর হয়। এর বাইরে মনটাকে তৈরি করার একটা ব্যাপারও তো আছে। অচেনা একটা ছেলের সঙ্গে আধ ঘণ্টা আলাপের পর ক্যামেরার সামনে সব কিছু করতে হবে সহজভাবে। একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায়, যেটা খাওয়ার পনেরো মিনিট পর লজ্জা-ঘেন্না-ভয় বলে বিশেষ কোনও অনুভূতি থাকে না। কিন্তু সে বড়ি খেলে চোখটা ঢুলুঢুলু দেখাবে। চেষ্টা করতে হবে ট্যাবলটে না খেয়ে কাজ করতে।

ফুলিয়া বোঝে। তারপর সে জানতে চায় মুনমুনের মোবাইলে তেমন কোনও ভিডিয়ো আছে কি না। সে কখনও দেখেনি।

মুনমুন মোবাইলটা বার করে একটা ভিডিয়ো ফাইল চালিয়ে দেয়। সেটা দেখতে দেখতে প্রথমে ফুলিয়ার কালো মুখটা বেগুনি হয়ে ওঠে। তারপর সে খিলখিল করে কিছুক্ষণ হাসে। শেষে মুখে হাত চাপা দিয়ে মাতৃভাষায় যেটা বলে, তার বাংলা করতে দাঁড়ায়, 'আমাকেও চুষতে হবে নাকি দিদি? এঃ, কী কালো!'

মুনমুন হাসে। ঢালু জমির ওপারে সরু একটা নদী। জলহীন। পাথরে ভরতি। তার ওপারে সবুজ অগভীর বনাঞ্চল পেরিয়ে মাথা উঁচিয়ে থাকা নীল পাহাড় থেকে ভেসে আসা শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ায় মিশে যেতে থাকে ভিডিয়ো থেকে ছিটকে আসা শীৎকারের মিহি শব্দ। সে ভিডিয়োর দিকে অপলক তাকিয়ে পাকা ফুলিয়া যেন অতি সিরিয়াস এক শিক্ষানবিশ।

৩৫

কফি আর ডিমের পকোড়ার অর্ডার দিয়ে সুষমা বলল, 'তুমি নবীন রাইয়ের হয়ে কাজ করছ— এটা আমি জানি। তোমার লেটেস্ট প্রজেক্ট হল ঋষিকাম, তা-ই তো?'

'আর কী জানেন?' মনামি হালকা হেসে পালটা জানতে চাইল। সুষমাকে সে মাপার চেষ্টা করছিল। নবীন রাইয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে। সুষমাও কি নবীন রাইয়ের সেক্স ভিডিয়োতে কাজ করেছে?

'নবীন রাইয়ের সঙ্গে কিন্তু আমার আলাপ নেই। আই জাস্ট হার্ড অ্যাবাউট হিম।'

'আমার কাজের কথা জানলেন কী করে?' মনামির কৌতূহল বাড়ে।

'আমাকে তুমি বলো মনামি।' সুষমা একটু ঝুঁকে টেবিলের উপর দুটো কনুই রেখে বলল, 'তুমি নবীন রাইয়ের সঙ্গে কাজ করছ মানে একটা র‍্যাকেটের হয়ে কাজ করছ। আরও একটা র‍্যাকেট থেকে তোমাকে অফার করা হয়েছে, ইভ্‌ন ইউ গট অ্যাডভান্স। আমি এই দুটো র‍্যাকেটকেই জানি। বাট আই উড লাইক টু রিমেইন ফ্রি-লান্সার।'

কফি আর পকোড়া টেবিলে দিয়ে গিয়েছে। মনামির প্লেটে পকোড়া আর সস ঢেলে দিতে দিতে কথাটা শেষ করল সুষমা।

'তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ?'

মনামি এবার সুষমার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল। সুষমা কিছু না বলে মিষ্টি করে হাসল একবার।

'ঋষিকাম কে করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আই গট এনাফ অ্যাডভান্স। যে র‍্যাকেট টাকা দেবে, আমি তাদের হয়ে কাজ করব। কিন্তু আমাকে তুমি বোধহয় এর বাইরে অন্য কিছু বলতে চাইছ?'

মনামির কথাগুলো শুনে সুষমা একটা পকোড়ায় আলতো কামড় দিয়ে বলল, 'ইউ ভেরি বিউটিফুল মনামি। আমি তোমাকে প্রজেক্ট করতে চাই। আমার মনে হয়, আমাদের মতো দু'জন মেয়ে একসঙ্গে কাজ করলে টাকা অনেক বেশি কামাতে পারব।'

'একসঙ্গে বলতে কী মিন করছ?'

'ভিডিয়ো আমি বানিয়ে বেচব মনামি। ফিফটি ফিফটি। তুমি দিল্লি এক্স আর ডার্ক ক্যালকাটা বলে কিছু জানো?'

'প্লিজ ক্লিয়ার।'

'দুটোই এই দেশের প্রাইম ক্রিমিন্যাল অর্গানাইজেশন। তুমি নবীন রাইয়ের হয়ে কাজ করেছ, মানে দিল্লি এক্স-এর হয়ে কাজ করেছ। ডার্ক ক্যালকাটা তোমাকে হাইজ্যাক করার জন্য অ্যাডভান্স করেছে। কিন্তু তোমার মতো মেয়ে পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও একটা বিশেষ গ্রুপের হয়ে থাকবে কেন? ইউ ক্যান ইজিলি প্রোডিউস ইয়োর ওন।'

'কীভাবে?'

কফি শপে ভিড় ছিল না। তবুও মনামির জিজ্ঞাসার উত্তর খুব নিচু গলায় দিয়েছিল সুষমা। বলেছিল, 'সেই ডিটেল এখানে বলা উচিত হবে না। তুমি কি আমাকে তোমাদের ফ্ল্যাটে ডাকতে পারো?'

এটা কালকের কথা। আজ মনামি তার নিজের ঘরে সুষমার সঙ্গে 'ডিটেল' জেনেছে এক ঘণ্টা ধরে। পর্ন ভিডিয়ো বিক্রি করার জায়গা সুষমার ভালই জানা আছে। শুটিং থেকে শুরু করে নায়ক জোগাড় করা, সব সে-ই করবে। মনামির কাজ শুধু অভিনয় করা। শুধু ভিডিয়ো নয়, দু'জনে মিলে ডুয়ার্সে আসা মোটা পকেটের কাস্টমারকে সার্ভিস দেওয়ার একটা গুপ্ত এজেন্সিও তারা করবে। সার্ভিস দু'জনেই দেবে। কখনও কখনও শরীরের জালে ফেলে রুই-কাতলা ধরবে। তাদের কিডন্যাপ করে পয়সা আদায়ের জন্য 'দল' হাতে আছে সুষমার।

'তুমি তোমার শরীর আর অ্যাপিল দিয়ে একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পারো মনামি।' শেষে বলেছে সুষমা, 'আমার নিজেরটা ছাড়াও এইরকম একটা শরীর পাচ্ছিলাম না বলে চুপচাপ ছিলাম।'

তারপর সঙ্গে আনা ব্যাগটা থেকে একটা ক্যামেরা বার করেছে। মনামির দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'লেট'স স্টার্ট আওয়ার ফার্স্ট প্রজেক্ট। ক্যাটাগরি ইজ সোলো গার্ল মাস্টারবেশন উইথ অর্গাজম।'

'মানে?' চমছে উঠেছে মনামি, 'আর ইউ আস্কিং মি টু অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য সোলো গার্ল?'

'ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট অলসো। স্টকে সব চাইতে সেক্সি নাইটওয়্যার যেটা আছে, পরে এসো। তারপর ওই বিছানায় যাও। রিমুভ অল ক্লোদস অ্যান্ড স্টার্ট ফিঙ্গারিং।'

'ধ্যাৎ!' মনামি হঠাৎ লজ্জা পেল।

'লুকিং সো সেক্সি!' সুষমা ব্যাগ থেকে ট্যাবলেটের স্ট্রিপ বার করে একটা বড়ি ছিঁড়ে এগিয়ে দিল— 'ফার্স্ট টাইম দিস উইল হেল্প

ইউ। খেয়ে নিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করতে যাও। দেন এভরিথিং উইল বি কাম অ্যান্ড ফাইন!'

ওষুধের ক্রিয়া পনেরো মিনিটের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল মনামির মনে। সহসা সব কিছু প্রবল আনন্দময় হয়ে উঠল তার চারপাশে। নাইটওয়্যারটা পরতেই শরীর অবশ হয়ে যেতে লাগল কাম-ভাবনায়। হস্তমৈথুন সে অনেকদিন ধরেই করে আসছে। এই মুহূর্তে মনামির মনে হল, সেটাই অসম্ভব কাম্য।

'ওয়ান্ডারফুল!' নতুন সাজে মনামিকে দেখে সুষমা অস্ফুটে বলল, 'নাউ জাস্ট গেট ইনভল্‌ভড ইন ফিঙ্গারিং।'

সর্বাঙ্গে আশ্চর্য লাস্য তুলে মনামি বিছানায় বসে একটা বালিশ টেনে দিয়ে হেলান দিল। এর পর সে ধাপে ধাপে যেন উঠতে শুরু করল সুখস্বর্গে। একের পর এক ধাপ পেরিয়ে সেই স্বর্গের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে কয়েক পলকের জন্য ডুবে গেল অনির্বচনীয় সুখানুভূতির সমুদ্রে। হারিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, তখন দেখল নগ্ন শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। শরীরের কোনও ভার যেন নেই। আর উলটো দিকে সুষমা ক্যামেরার ডিসপ্লে দেখছে মুগ্ধ চোখে।

'এক্সেলেন্ট! পুরো ন্যাচারাল! সেভেনটিন মিনিটের এই ভিডিয়ো ফাইল থেকে আমরা কত পেতে পারি জানো?'

অঙ্কটা বলল সুষমা। মনামি সেটা শুনে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অ্যাত্তো!'

৩৬

'ঋষিকাম' প্রজেক্টটা আপাতত বন্ধ রাখার জন্য নবীন রাইয়ের সমস্যা ছিল না। বিনা নোটিশে এমন অনেক কাজ এই জগতে স্থগিত রাখতে হয়। প্রশাসনের কেউ কেউ মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয় কয়েকদিন চুপ থাকার জন্য। তাই গোড়ায় বিষয়টাকে সে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু দাসবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে বেশ চিন্তায় পড়েছে। দাসবাবু কলকাতায় যাবেন বলে ফ্লাইট ধরার জন্য শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। বাগডোগরায় যাওয়ার আগে নবীন রাইয়ের ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছিলেন। তাঁকে বিনা নোটিশে ফ্ল্যাটে চলে আসতে দেখেন নবীন রাইয়ের মনে খটকা লেগেছিল। দাসবাবু সেটা দূর করে মনের মধ্যে বিস্তর প্রশ্ন ঢুকিয়ে একটু আগে বিমান ধরবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছেন।

নবীন রাই অনেকদিন ধরেই নীল ছবির জগতে কাজ করছেন। অনেক জায়গা থেকে তাঁর ক্লায়েন্টরা আসে। কলকাতার পার্টিও আছে। কিন্তু ডার্ক ক্যালকাটা বলে যে একটা গ্রুপ আছে, সেটা তাঁর জানা ছিল না। বাইরের দলগুলো তাঁর ব্যবসায় শুধু টাকা লাগায়। বদলে ভিডিয়ো নিয়ে চলে যায়। কিন্তু ডার্ক ক্যালকাটা সব ক্ষেত্রেই নিজের নেটওয়ার্ক দিয়ে কাজ করানোর পক্ষপাতী। এর মানে হল, ডুয়ার্সে নীল ছবি বানাতে চাইলে তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বানাবে। তারপর কম টাকায় বাইরের পার্টির কাছে বেচে দিয়ে নবীন রাইদের বাজারে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। দাসবাবুর কথা থেকে এই ব্যাপারটা অনুধাবন করার পর নবীন রাইয়ের রক্তচাপ কিঞ্চিৎ হলেও বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে নিজে কি ফেলনা? ডুয়ার্সে যে কাউকে চিরদিনের জন্য হাপিস করে দিতে তার মতো ওস্তাদ ক'জন আছে? শুধু ডুয়ার্স কেন, গোটা নর্থ-ইস্টে তার নেটওয়ার্ক কাজ করে। সুতরাং ডার্ক ক্যালকাটা বাড়াবাড়ি করলে তাদের খুঁজে বার করে হাপিস করে দেওয়াটা খুব একটা কঠিন কিছু নয় নবীন রাইয়ের কাছে। কিন্তু এতে সমস্যা অন্য দিকে বাড়বে। অন্ধকার জগতের এগজিবি টিটা মার খেয়ে যাবে এসব খুনখারাপি হতে থাকলে। দলগুলো নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি চায় না। বোঝাপড়া বজায় রাখলেই সুবিধে অনেক বেশি। ডার্ক ক্যালকাটা কি এই জায়গাটায় আঘাত হানতে চাইছে? দাসবাবুর দুটো লোককে খামকা মারল কেন?

নবীন রাই সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উত্তেজিত অবস্থাতেই তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য ঝটপট তৈরি হয়ে নিলেন। পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে নবীন রাই বেশ টিপটপ ব্যক্তি। কিছুক্ষণ পর হোন্ডা সিটিটা চালিয়ে তিনি যখন আবাসন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠলেন, তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে উত্তেজিত। কেবল গাড়িটা কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে চলতে শুরু করল। ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল, নবীন রাই শুকনা স্টেশনের পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে স্টিয়ারিং-এ একটা হাত রেখে একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। একজন আছে, যে গাড়িটা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে 'সঙ্কেত' বুঝে নিয়ে চলে আসবে। নবীন রাই তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পর লোকটি এল। নবীন রাই গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিলেন। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা লোকটি কোনও কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসল। মিনিট তিনেক বাদে যখন শুকনার অরণ্যের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা ধরে গাড়িটা কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে, তখন নবীন রাই নেপালিতে বললেন, 'আমাদের চেনা দলগুলোর বাইরে এলাকায় কেউ ঢুকেছে। কোনও খবর জানা আছে?'

'না দাদা।'

'ডার্ক ক্যালকাটা বলে কোনও পার্টি?'

নবীন রাই সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উত্তেজিত অবস্থাতেই তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য ঝটপট তৈরি হয়ে নিলেন। পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে নবীন রাই বেশ টিপটপ ব্যক্তি। কিছুক্ষণ পর হোন্ডা সিটিটা চালিয়ে তিনি যখন আবাসন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠলেন, তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে উত্তেজিত। কেবল গাড়িটা কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে চলতে শুরু করল।

'এদিকে কেউ এখনও আসেনি দাদা।'

'খোঁজ লাগাও। আমার এক ক্লায়েন্টের টিমের দু'জনকে খুন করেছে। পুরো প্ল্যান করে।'

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'একটা খবর শুনেছিলাম। বিশ্বাস হয়নি। সেটা সত্যি হলে অনেক কিছু হতে পারে দাদা।'

'কী?'

'পল অধিকারী বেঁচে আছে।'

নবীন রাইয়ের মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। পিছনের সিটে যে বসে আছে, তার বর্তমান নাম রতন বিশ্বকর্মা। নেপালের মাওবাদী গ্রুপের অন্যতম সদস্য। এখন সে দেশের সরকারের তাড়ায় ভারতে লুকিয়ে আছে। পল অধিকারী বেঁচে থাকার কথা অন্য কেউ বললে নবীন রাই তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু রতন বিশ্বকর্মা ভুলভাল বলবে না। তা ছাড়া গল্পটাও মিলে যায় পল অধিকারী বেঁচে থাকলে। ডার্ক ক্যালকাটা নামে কেউ যদি ডুয়ার্সের ময়দানে তাঁবু গাড়তে চায়, তার মূল খুঁটিটা কে হবে— এটা নবীন রাইয়ের মাথায় খেলছিল না এতক্ষণ। খুঁটির নাম পল অধিকারী হলে সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

'আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। তোমাকে মিরিকে নামিয়ে দিচ্ছি। ট্রেন ধরে ফিরে যাও। আর পল অধিকারীর খবরটা যত তাড়াতাড়ি পারো কনফার্ম করো।'

হিস হিস করে বললেন নবীন রাই।

(ক্রমশ)

মউয়ামারি

বছর বিশেক আগের কথা। পনেরো বিঘা জমিতে দিঘি খনন করিয়েছিলেন রজিত রায় নামে স্থানীয় এক ভদ্রলোক। পুরো জমির সমস্ত মাটি স্তূপ করে রেখেছিলেন এখানে। বুনেছিলেন ভিনদেশি ঘাস, নানারকম ফুল আর ফলগাছের চারা। কুড়ি বছর পর সেই জায়গার খোলনলচে বদলে কী হয়েছে, তার নমুনা এই ছবি। ময়নাগুড়ির কাছে মউয়ামারি গ্রামে মনোরম এক খামারবাড়ি তিল তিল করে সযত্নে বানিয়েছেন রজিতবাবু। এরকম দু'-তিনটি কুটির আছে এখানে। সেখানে গিয়ে নিভৃতিতে অবকাশ যাপন করে এলাম সে দিন। পোষা পুকুরে কিলবিল করছে মাছ। ছিপ দিয়ে অগুনতি মাছ ধরা হল। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দিতে হল, কেননা এখানে এটাই দস্তুর। আহারের জন্য কলাপাতায় ধোঁয়া-ওঠা সরু চালের ভাত এল। সঙ্গে কচি পাঁঠার মাংসের গরগরে ঝোল আর মাটির গেলাসে জল। সুখের কথা এটাই যে, রজিতবাবু তাঁর ফার্মহাউসের দরজা অতিথিদের জন্য খুলে দিয়েছেন। যোগাযোগ করা যেতে পারে এই নম্বরে—৯৯৩২৮৬২৪১২।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

কিঙ্কিণীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

উত্তরবঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রবাদপুরুষ কমলাচরণ ভট্টাচার্যর স্মৃতির উদ্দেশে জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হল কিঙ্কিণীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। স্মৃতি রোমন্থন ও প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করলেন স্বরূপ ব্যানার্জি, ডেপুটি কালেকটর, জলপাইগুড়ি। গণেশবন্দনা, রবীন্দ্র ও নজরুল নৃত্য, লোকসংগীত, রাজস্থানি নৃত্যের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে দিলেন শর্মিষ্ঠা মুন্সির ছাত্রছাত্রীরা।

লখনউ ঘরানার কথক নৃত্যে একতালের ছাপ রাখলেন দেবার্পিতা, রাইমা ও গরিমা সেন। সোমদত্তার নৃত্য, পারমিতা সেন ও ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীর রবীন্দ্রসংগীতকে শ্রোতারা তারিফ জানান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মাতিয়ে দেন দেবার্পিতা মজুমদার, রাইমা ভৌমিক ও গরিমা সেন— পিংগা দো পুরী মারাঠি নৃত্যের মাধ্যমে। শর্মিষ্ঠা মুন্সির অপূর্ব সংগ্রহ ও উপস্থাপনা শ্রোতারা মনে রাখবেন অনেকদিন।

প্রদীপ মুন্সি

নজরুল-রবীন্দ্র সন্ধ্যা

মালবাজার তথা ডুয়ার্সের সুপরিচিত সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্র 'শ্রুতি-সুরবীণা'র ব্যবস্থাপনায় মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ নজরুল-রবীন্দ্র সন্ধ্যা (অনুষ্ঠানের নামকরণে আগে নজরুল, তারপর রবীন্দ্রনাথকে রেখেছিলেন উদ্যোক্তারা)। 'শ্রুতি- সুরবীণা'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতী ইলারানি ঠাকুর প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। এর পর বিয়াল্লিশজন ছাত্রছাত্রীর সমবেত কণ্ঠে উদ্‌বোধনী নজরুলগীতি 'আমাদের ভালো করো হে ভগবান' উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। ওই দিন আড়াই বছর বয়সি শিশুশিল্পী থেকে শুরু করে ৫০ বছর বয়সি প্রবীণ শিল্পীদের সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দুই বিশ্ববরেণ্য কবি-সংগীতকার- সুরকারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শাশ্বতী ঠাকুর পরিচালিত 'শ্রুতি-সুরবীণা'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি-আবৃত্তিকার অধ্যাপক ড. চন্দন খাঁ।

'অধিযুগ' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ

গত ৫ জুন লাটাগুড়ির নেতাজি সংঘে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হল সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন বিষয়ক পত্রিকা— অধিযুগ। পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যিক পরান গোপ ও কার্যকরী সম্পাদক তপনকুমার রায়ের কথায় জানা গেল, মাঝে বহু বছর বন্ধ থাকার পর নতুন করে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। লাটাগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাহিত্যানুরাগী মানুষের সহযোগিতার নবপর্যায়— ১ম সংখ্যা হিসেবে নতুন করে পথ চলা শুরু হল অধিযুগ-এর। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধক ভ্রমণ সাহিত্যিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্যে পর্যটনে লাটাগুড়িকে বিশেষভাবে তুলে ধরার গুরুত্ব আরোপ করেন। কবি পূর্ণপ্রভা বর্মণ, মহুয়া গোপ, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ড. আনন্দগোপাল ঘোষ। এ ছাড়াও সাহিত্যিক উমেশ শর্মা, কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মালের বিধায়ক বুলু চিক বড়াইক।

সুধাংশু বিশ্বাস

ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা

পূর্বাশা শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে উচ্চবিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। প্রত্যন্ত গ্রামগুলো সাধারণত জঙ্গল ট্রেকিং, বোটিং (শিক্ষানবি- থেকে অভিজ্ঞদের জন্য)-এর জন্য আদর্শ। সুন্দরবন চরঘেরি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নরম কাদা, জঙ্গল দিয়ে হাঁটা ও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বোটিং-এর অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ করে দেয়। এই অঞ্চল জুলজি ও বটানির ছাত্রছাত্রীদের জন্যও বিশেষ আকর্ষণীয় প্যাকেজ টুরের সুযোগ করে দেয়। ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও কষ্টের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তারা এ-ও শিখতে পারে, কষ্টকে কী করে জয় করে জীবনে জয়ী হতে হয়।

উমাশংকর মণ্ডল

রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় আলিপুরদুয়ার

জেলা গঠনের পর এই প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা অ্যাথলেটিক দল কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ৯ জুন থেকে ১২ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়— হাসিবুল হক, সোনম বসুমাতা, সাগর ওঁরাও, রাজদীপ কার্গী, অংশুমান তালুকদার, রাহুল কার্গী, পাপাই রায়, অনির্বাণ কিসকু, তনুশ্রী সরকার, দীপালি কেরকাট্টা, তনুশ্রী রাভা, বিম্পি দাস, ক্যামেলিয়া রায়, মধুমিতা রায়, অনামিকা সূত্রধর। ম্যানেজার পরাগ ভৌমিক, কোচ অনিলচন্দ্র তালুকদার।

বেঙ্গল সিলেকশন ট্রায়ালে নাট্যসংঘের দুই

রাজ্যস্তরে ভলিবলে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেঙ্গল সিলেকশন ট্রায়ালে সুযোগ পেল কোচবিহার নাট্যসংঘ ক্লাবের বিক্রম দাস ও রজত বর্মন। আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ কলকাতায় রাজ্য ভলিবল সংস্থার মাঠে এই ট্রায়াল ক্যাম্প মাস দুয়েক ধরে চলবে বলে জানান সংস্থার ক্রীড়া সম্পাদক জহর রায়। তিনি আরও জানান, সদ্যসমাপ্ত রাজ্য ভলিবল সংস্থা আয়োজিত ২৫তম বয়সভিত্তিক রাজ্য ভলবল চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁদের ক্লাব অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই খেলায় তাঁদের পুরুষ দল সেমিফাইনালে হাওড়ার অনুশীলনী চক্রের কাছে ২-৩ সেটে হেরে যায়। তবে তাঁদের নাট্যসংঘ ক্লাবের দু'জন খেলোয়াড় বেঙ্গল সিলেকশন ট্রায়ালে সুযোগ পাওয়ায় স্বভাবতই তাঁরা খুব খুশি।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

সেসব দিন... স্বপ্নরঙিন

নাথুয়ার দিকে তখন যেত লজ্‌ঝড়ে একটি হাটবাস। সোম ও শুক্রবার হাটের দিন হলেও বাসটি রোজ চলত। এবং তার নাম হাটবাস! সে এক মহাজাগতিক যান। জানালার কাচ উধাও। গা থেকে যে কোনও সময় টিন-কাঠ খুলে পড়তে পারে। ড্রাইভার-কন্ডাক্টর পৃথিবীর সবচেয়ে সহনশীল মানুষ। তাঁরা হাজার গালি খেলেও রাগেন না। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে জানেন দু'-চারজন প্যাসেঞ্জারের জন্য!

ধূপগুড়ি থেকে গাড়ি ছাড়তেই চাইত না। অনিচ্ছায় তবু কখনও স্টার্ট নিতে হত। সেই সূচনার ছিল এক ভয়ানক পিলে চমকানো আওয়াজ। অবশ্য তার জন্য সাধ্যসাধনাও কম হত না। বিস্তর ঠেলাঠেলিতে এক সময় গা-ঝাড়া দিত ডুয়ার্সের সেই প্রাগৈতিহাসিক হাটবাস।

বাসটা ছিল একটি বাজার। হাটও বলা যেতে পারে। বোটকা গন্ধ। মানুষ, মালপত্তর গাদাগাদি। বাসেই কেউ কেউ ফেলছেন পানের পিক। খইনি চালাচালি। রাজবংশী পুববাংলা রাভা মেচ... ভাষার ককটেল।

ডাউকিমারি গিয়ে বাস দাঁড়িয়ে পড়ত। যেন গোঁয়ারগোবিন্দ— 'আর যাব না।' কী শান্ত ড্রাইভার, নিশ্চল কন্ডাক্টর। বিড়ি ফুরাতেই চায় না। উদাস দৃষ্টি প্রান্তর আকাশ ছাড়িয়ে কোন সুদূরে। তাদের মনে হত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক।

অবশেষে এক সময় গাড়ি পৌঁছাত নাথুয়া। সেখানেও মানুষগুলোর যেন কোনও তাড়া নেই জীবনে। আস্তে আস্তে সকাল আসে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে দিন এগয়। নতুন মাস্টারমশাইয়ের অবাক লাগে সব। শুধু জলঢাকা চা-বাগান তার নির্দিষ্ট ছন্দে চলে। তাদের তো নিয়মে বাঁধা ঘণ্টাসমূহ। নিস্তরঙ্গ জীবনে নতুন কিছু তরঙ্গ আনবে তো বটেই। মাস্টারমশাইও নাথুয়ায় বেশ তরঙ্গ আনলেন। তিনি আবার কবিতা লেখেন, আবৃত্তি করেন, গান বাঁধেন, আকাশবাণীতে তাঁর নাটক হয়। তাঁকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি তো হবেই।

আর মাস্টারমশাই ভাবলেন স্বর্গে এসে পড়েছি। এত সবুজ চারদিকে। নেপালি ছাত্রছাত্রীদের ডাকে একদিন মোষের বাথান দেখতে যাওয়া। সাইকেলে যেতে যেতে কী আনন্দ, কী আনন্দ! ছেত্রি গুরুং ছাত্রীদের বললেন, নেপালি গান গাও। তারা গাইতে লাগল...। আর মাস্টারমশাই ভাসতে লাগলেন কোন অজানা ঢেউয়ে।

এক সময় আলপথ। তারপর বনের সীমায়। সবুজের উপর বিছানো কালাপানি নদী। সবুজের উপর কী নিখুঁত কালের টলটলে জল। তারা বলল, এই দেখুন স্যার, গণেশবাবার পায়ের ছাপ। রোজ আসে। জল খায় এখানে। হাঁটু ভেজানো জল পেরিয়ে একটু এগতেই খয়ের গাছের বন। একটি অন্যরকম শান্তিনিকেতন। তারা বলল, ক'দিন আগেই গোরুমারা থেকে বেরিয়ে একটি গন্ডার এখানে ঠাঁই গেড়েছিল। কত সাধ্যসাধনা করে সেটাকে বনে ফেরত করছে এদিক-ওদিক। নেপালি ছাত্রীর ফরসা মুখে শেষবেলাকার আলো।

তারপর তারাই নিয়ে গেল তাদের বাথানে। শয়ে শয়ে মোষ। মাস্টারমশাই এই প্রথম দেখলেন মহিলা মোষ আর শিশু মোষ! এবং তারা গ্লাস ভরে এনে দিল মোষের দুধ। সে দুধও তো প্রথম খাওয়া!

অনেকদিন পর শিলিগুড়ি থেকে ভ্রামণিক গৌরীদা সেই তরুণ মাস্টারমশাইকে লিখেছিলেন, বড্ড কষ্ট হয়। সেই খয়ের গাছগুলো একটিও আর নেই। সব কেটে ফেলেছে। তারপর আর কোনও দিন মাস্টারমশাই সেই কালাপানির দিকে যাননি।

কত কিছু কত তাড়াতাড়ি পালটেও গেল। ডুয়ার্সে থেকেই ডুয়ার্সের সেই

> মাস্টারমশাই তাকিয়ে আছেন অদ্ভুত পাওয়ার স্বর্গীয় আনন্দে। হঠাৎ কত আওয়াজ। টুং টাং ঢং ঢং টিং টিং...। মোষেরা বাথানে ফিরছে। বন থেকে। গলায় সরু ঘণ্টা, মাঝারি ঘণ্টা, অতিকায় ঘণ্টা। সব আওয়াজ মিলে এক দুরন্ত সিম্ফনি। তাদের খুরে উড়ছে ধুলো। দিগন্ত ঢেকে দেওয়া সেই ধুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাহিত্যের মাস্টারমশাই এই প্রথম অন্তর থেকে শিখে নিলেন 'গোধূলি' শব্দটির মানে।

নিয়েছে বন দপ্তর!

বিকেল সন্ধের দিকে গড়াচ্ছে। মাস্টারমশাই তাকিয়ে আছেন অদ্ভুত পাওয়ার স্বর্গীয় আনন্দে। হঠাৎ কত আওয়াজ। টুং টাং ঢং ঢং টিং টিং...। মোষেরা বাথানে ফিরছে। বন থেকে। গলায় সরু ঘণ্টা, মাঝারি ঘণ্টা, অতিকায় ঘণ্টা। সব আওয়াজ মিলে এক দুরন্ত সিম্ফনি। তাদের খুরে উড়ছে ধুলো। দিগন্ত ঢেকে দেওয়া সেই ধুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাহিত্যের মাস্টারমশাই এই প্রথম অন্তর থেকে শিখে নিলেন 'গোধূলি' শব্দটির মানে।

মোষেরা ফিরে যাচ্ছে তাদের বাথানের দিকে। আর মাস্টারমশাইয়ের প্রাণে বাজছে ভাওয়াইয়া গান 'মইষ চড়ান মোর মইষাল বন্ধুরে তোর্সা নদীর চড়ে...'। মাস্টারমশাই দেখছেন মোষের পায়ের ছলছলাতে নদীর নদীয়ালি মাছেরা কোণঠাসা। তারা খলবল মাস্টারমশাই বড় বেদনায় দেখতে থাকেন, পালটে যাচ্ছে কত কিছু। সেই সারল্য, সেই অনাবিল নিসর্গ, সেই প্রাণের টান...।

তারা এল দল বেঁধে— আপনাকে আমাদের চাই। চাইই। দাবির মধ্যে কোথাও কোন ফাঁকফোকর নেই। কেন চাই? না, নাটক লিখতে হবে, গান বাঁধতে হবে, রিহার্সাল দেওয়াতে হবে।

মাস্টারমশাইয়েরও মনে হল, আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি!

নাথুয়ার অলস সন্ধেগুলো হঠাৎ জেগে উঠল। দীপিকা ছেত্রি হোক না নেপালি, সে তার স্যারের বাংলা নৃত্যনাট্যে নেচে উঠল। সে ও তার সঙ্গিনীরা মূর্ত করে তুলল অস্কার ওয়াইল্ডের বাংলা রূপান্তরে 'স্বার্থপর দৈত্য'।

তারপর নাথুয়ায় শুরু হল এক স্যার-যুগ!! স্কুলে যেমন, তেমনি স্কুলের বাইরেও। স্যারও তো নিতে লাগলেন, প্রাণ

ভরে। নিসর্গ তাঁকে দিল কথা ও সুর। ছেলেমেয়েগুলোর সৃজন-আনন্দ দেখে তিনি নতুন নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে লাগলেন। কবিতায় ঝেঁপে এল ডুয়ার্স।

সে সময়টা কত সুন্দর ছিল। আজও ভাবলে চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে। এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর বিয়ে ঠিক হল। তিনি অন্যভাবে সব ভাবেন। বিয়ের তারিখ ভাবলেন একুশে ফেব্রুয়ারি। এক গরিব কন্যে, স্যার নিজেও তো গরিব। তাই সইসাবুদের বিয়ে। শাশুড়ি বললেন, বাবা, কিছু নেবে না বলছ, এই একটি আংটি রেখেছি, এটা নাও। গোঁয়ার স্যার বললেন, তাহলে যে বিয়ে হবে না। দু'তরফেরই জেদ! দেয়া আর নেয়া নিয়ে। অবশেষে শর্ত হল, রেজিস্ট্রির দিন শাশুড়ি আশীর্বাদি হিসেবে আংটিটি দেবেন, আর জামাই ক'দিন বাদে সেটা ফেরত দিয়ে দেবে। এক একুশে ফেব্রুয়ারি রেজিস্ট্রি, পরদিন ভোরে পাগল-স্যার নবপরিণীতা বউকে নিয়ে শীতের দার্জিলিঙে। বিয়ের রাতে মেয়েটিকে বললেন, আমাদের সংসার কিন্তু অন্যরকম, আমরা সৃজনে থাকব, মানুষের পাশে থাকব।

দার্জিলিং থেকে নাথুয়ায় ফিরে স্যার অবাক। তাঁর ভাড়া বাড়িটিকে চেনা যাচ্ছে না। বিশাল গেট, লেখা 'বধূবরণ'। জোরদার আয়োজন চলছে। উঠোনে বিরাট সাংস্কৃতিক মঞ্চ, চারদিকে ফুল আর ফুল।

নাথুয়ায় এসে যাকে দাদা বলে ডেকেছিলেন, তিনি পাশের স্কুলে পড়ান। সেই জীবনদা বললেন, তোমার সব প্রিয়জনকে ফোন করে দাও। কাল তোমার বউভাত। সবাইকে আসতে বলো। সারারাত গান হবে, নাচ হবে, কবিতা হবে।

নতুন স্যার বললেন, এ কী করেছেন? এ তো অনেক খরচ! আমার যে জমানো কোনও টাকাই নেই।

জীবনদা বললেন, ওসব নিয়ে ভাববে না তো। এখন আনন্দ করো। সবাইকে ডাকো। নাথুয়ার সবাই নিমন্ত্রিত তোমার বউভাতে। তুমি এত দাও, নাথুয়া তোমায় কিছু দেবে না?

পরদিন ব্যাঙ্কে গিয়ে স্যার জানতে পারলেন, জীবনদা তাঁর রেকারিং ডিপোজিট মাঝপথে ভেঙে ফেলেছেন। রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, তবু যে তাঁকে দাদা বলে ডেকেছে, তার জীবনটাকে একটু রঙিন করে দিতে তিনি তাঁর আগামীর সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন।

সেই স্যারের বিবাহিত জীবন দু'দশক পেরিয়ে গিয়েছে। এখন চুলে পাক ধরছে। মাঝে মাঝে একা একা তিনি ভাবেন, ডুয়ার্স পারে, উত্তর পারে, এমন হৃদয়ের চাষ তো এখানেই হয়!

পথিক বর

মধু চা-বাগানের মিসিরভাই, কোথায় আছ তুমি?

মধু টি এস্টেট। প্রবেশপথে মস্ত গেট। ঢুকতেই কালো রাস্তার দীর্ঘতা আর কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার বিন্যাস। খানিকটা গেলে বাঁ হাতে বাংলোর গেট। লন। ফুল-পাখিতে, লাল ফড়িং আর প্রজাপতিতে মাতাল। সে লনেও মস্ত দু'টি কৃষ্ণচূড়া গাছে নরম কিন্তু অতি উজ্জ্বল ফুলেরা। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বাংলোর দরজায়। দুপুর ভাঙেনি। বিকেল আসেনি। একাই দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিসিরভাই। ওকে চিনতাম ছোট থেকেই। ম্যানেজার-বাংলোর গেটকিপার ছিল বোধহয়। ঠিক মনে নেই। আমাকে বলল, মিসি বাবা, সাহাব কাহাঁ?

আমি বসন্ত দেখছিলাম। টি এস্টেটের সেক্রেটারির মেয়ে।

বসন্ত-বাগানে চোখ রেখেই বললাম, বগান মে।

—লোটেঙ্গে কব?

—পাতা নহি।

—ম্যানেজার সাহাব ভি ঘর পে নহি হ্যায়। মুঝে বাত করনা হ্যায় উনলোগোকে সাথ।

একটা পাপিয়া আর একটা কোকিল বসন্তকে বসন্ত করে তুলেছে। একটু বিরক্তি নিয়েই বললাম, সাহাব লোগোকা বহত কাম হ্যায়, সমঝা? অব ইহাঁসে জাও।

মিসিরভাই তবু দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকল, মিসিবাবা...

আমি গাছের ডালে টুপ করে বসে পড়া একটা সবুজ-হলুদ পাখি দেখে অবাক হচ্ছিলাম। জবাব দিইনি।

—মিসিবাবা, তুম জানতে নহি? সাহাব কব লোটেঙ্গে? কব লোটেঙ্গে সাহাব? বোলো।

বুঝলাম মদ খেয়েছে। ভয় পাইনি। ওরা অমন ছিল না। ঠিক তখুনি বাংলোর গেটে বাপিদের জিপ।

বাপি, জেঠু (ম্যানেজার) আর বিশুকাকু (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) বাংলোর সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চা-পাতার কোয়ালিটি নিয়ে কী কী যেন বলছিল। বিকেল তখন নেমে পড়েছে। বাপি বড় সুন্দর করে হেসে আমাকে বলেছিল, ভেতরে যাও।

আমি যাইনি। কারণ ও বাগানে তখন বসন্ত বড় সজীব হয়ে আসত।

মিসিরভাই সরে গিয়েছিল ফুলের বাগানের দিকে। কাচের গ্লাসে জল এল। বাপিরা প্লেটের উপর থেকে গ্লাস তুলে সিপ করছে, মিসিরভাই হাজির।

—সাহাব!

জেঠু আর বিশুকাকু হতাশ মুখে একবার তাকাল। বাপি এগিয়ে গেল।

—ফির কেয়া হুয়া?

—সাহাব, নোকরি নহি করনা হ্যায় মুঝে।

—তো তুঝে কেয়া করনা হ্যায়?

—কুছ ভি নহি। সাফ বাত এহি হ্যায় কি মেরা রুপেয়া মুঝে দে দো।

জেঠু বলল, অব জাও। হমারা কাম হ্যায়। বাদ মে বাত করেঙ্গে।

নাছোড় মিসিরভাই। বাপি অনেক বুঝিয়েছিল। আমি আর বসন্ত দেখছিলাম না। কথা শুনছিলাম। তবে পর্দার আড়ালে। সাহেবরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে ফিসফাস করে মেনে নিয়েছিল ওর কথা।

—ঠিক হ্যায়। রুপেয়া তুঝে মিল জায়েগা। নোকরি ছোড়না হ্যায় তো ছোড় দে।

—এক বাত অউর সাহাব।

—ওহ্ গড! ফির সে? কেয়া?

—মেরে বেটে কো মেরা নোকরি দে দো সাহাব। মুঝে করনা নহি।

বাগানের সৌন্দর্য, সম্ভার, আপ্যায়ন— সব একই থাকাতে মিসিরভাইকে মনে ছিল না। কেটে গেল তারপর কত মাস, কত যে বসন্ত! একদিন জেনেছিলাম, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বেতন— সব নিয়ে মিসিরভাই কিনেছিল দামি খাট, সোফা সেট, ক্রকারিজ এবং স্কচ। সোফায় এলিয়ে দামি স্ন্যাক্স এবং সঙ্গে স্কচের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সারাটা দিন কেবল চিৎকার করে নাকি বলেই চলেছিল, 'ম্যায় সাহাব হুঁ— সাহাব হুঁ ম্যায়— বাবু হুঁ— !!!'

চাকরিটা সাহেবদের দাক্ষিণ্যে ওর ছেলেই পেয়েছিল। এবং আর ফিরে তাকায়নি বাবার দিকে। হৃতসর্বস্ব শ্রমিক-সাহেব মিসির পাগল হয়ে ফিরত পথে পথে। খোঁজ তারপর মেলেনি আর। বাপিকে একদিন কাঁদতে দেখেছিলাম।

মধুপর্ণা রায়

দুই হাতে সংসার ও নৌকার হাল বেয়ে চলেছেন অর্চনা

জলকে ঘিরেই তাঁর জীবন বারোমাস্যা। বেঁচে থাকা জলের সঙ্গে যুদ্ধ করেই। সেই বেঁচে থাকার জন্য জলেই কেটে যায় তাঁর সারাটা দিন। তবে স্বেচ্ছায় বেছে নেননি ওই জল কিংবা জীবন। দুটো শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়েছে সংসার আর নৌকার। হাল ধরার তাগিদ আসলে সংসার। বছরের পর বছর সেই তাগিদেই নদীতে খেয়া পারাপার করে চলেছেন অণিমা চৌধুরি। সম্ভবত তিনিই ডুয়ার্সের একমাত্র প্রমীলা মাঝি।

কোচবিহারের কাছেই কালজানি নদী। নদীর এক প্রান্তে কালজানি, অন্য প্রান্তে নাটাবাড়ি। ওই কালজানি নদীতেই নৌকায় যাত্রী পারাপার করেন অণিমা। যে ঘাটে তাঁর নৌকা বাঁধা, তার পোশাকি নাম বলরাম আবাস ঘাট। গ্রীষ্মকালে নদীর জল কিছুটা শুকিয়ে গেলেও ভরা বর্ষায় তার রূপ বেশ সমীহ করার মতো। কিন্তু জলকে তিনি এতটুকু ভয় করেন না। শুধু মানুষ নয়, তাঁর নৌকায় এপার-ওপার হয় সাইকেল, বাইক থেকে শুরু করে কত কী যে, তার হিসাব অণিমা নিজেও রাখেন না। তবে যে দক্ষতার সঙ্গে অণিমা নৌকা পারাপার করেন, তার কাছে হার মানতে বাধ্য বহু দক্ষ পুরুষ মাঝিও।

জন্মের পর থেকে সংসারে শুধু অভাবই দেখেছেন অণিমা। পাঁচ ভাইবোনের সংসারে নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা। তাই কৈশোর পেরোনো বয়সেই নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে সংসারের জোয়াল। জল আর জীবনের এই অসম যুদ্ধে তাঁর স্বভাবেও এসে গিয়েছে একটা পুরুষালি ভাব। মা-ভাইয়ের সংসার টানতে টানতে নিজের আর আলাদা করে সংসার পাতা হয়ে ওঠেনি। যাত্রীদের হাঁকডাকে নদীর পাড় লাগোয়া ছোট্ট বেড়ার ঘরে বসে শান্তিতে যে দুপুরের গ্রাসাচ্ছাদন সারবেন, সে অবকাশটুকুও কি তাঁর মেলে? সূর্য ওঠার পর থেকে সেই যে শুরু, যাত্রী পারাপার করাতে করতে সূর্য ঢলে সন্ধ্যা নামে। সকাল-সন্ধ্যার এই জীবনকে জেনে-বুঝেই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন অণিমা। তা ছাড়া উপায় কী? তাই মেনেও নিয়েছেন। তবে জীবন তাঁর কাছে আরও কঠিন পরীক্ষা নিয়ে আসছে আগামী দিনে।

উন্নতি বা উন্নয়ন তো সকলেই চায়। আর সকলের জীবনেই তা খুশির বার্তা নিয়ে আসে। কিন্তু অণিমার জীবনে ওই উন্নয়নই বয়ে আনতে চলেছে এক ঘোর অনিশ্চয়তা। বহু বছর ধরেই কালজানি নদীর উপর একটা স্থায়ী সেতুর দাবি জানিয়ে আসছিল স্থানীয় মানুষ। ওই সেতুপথ তৈরি হলে নাটাবাড়ির লোকজনদের কোচবিহার আসার জন্য আর ঘুরপথ ধরতে হবে না। দুই পাড়ের লোকেদেরও প্রচুর সুবিধা হবে তাতে। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সেতুর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষও হয়ে যাবে হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যে। তখন তো তাঁর নৌকা ব্রাত্য হয়ে যাবে সাধারণের কাছে। সেই দিনের কথা ভাবতে গেলে সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তবুও জীবনের যুদ্ধে এতটুকু হার মানতে রাজি নন অণিমা। এই ঘাট ছেড়ে এবার হয়ত অন্য কোনও ঘাটে তাঁর নৌকা ভেড়ার অপেক্ষা। কারণ সংসার কিংবা নৌকা— কোনও হালই ছাড়লে যে তাঁর চলবে না।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

সাহিত্য-সংস্কৃতির ভুবনে সঞ্চিতার অবাধ বিচরণ

তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, দক্ষ মঞ্চ সঞ্চালক, মঞ্চাভিনেত্রী, আবৃত্তিকার, বেতারনাট্যশিল্পী এবং সমাজসেবী। ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তিচর্চা এবং কবিতা লেখায় মনোনিবেশ। ১৯৭১/৭২ সাল থেকেই তরুণতীর্থ, বনমহল, সপ্তর্ষি পাদদেশ— ডুয়ার্সের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সম্পাদনায় শামুকতলা বাজার থেকে প্রকাশিত হত 'কচিপাতা' নামক একটি দেওয়াল পত্রিকা। পত্রিকাটি সেই সময়ে শামুকতলা বাস স্ট্যান্ডে মাসিক দেওয়ালপত্রিকা হিসেবে টাঙানো থাকত। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক মুদ্রিত পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই 'কচিপাতা'ই প্রথম দেওয়ালপত্রিকা বা মুদ্রিত পত্রিকা, যা মহিলা উদ্যোগে এবং মহিলা সম্পাদনায় আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্স থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সম্পাদনা করেন 'দুন্দুভি', 'নারীবার্তা', 'স্বয়ংসিদ্ধা' ইত্যাদি পত্রিকা। এ ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'নিষিদ্ধ ঘাটে দাঁড়িয়ে', 'হেঁটে যাব সমান্তরাল', 'ভেসে যাক মান্দাস' পাঠকের মন জয় করেছে। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর দু'খানি ছড়ার বই 'চিড়িয়াখানায় টুসি', 'ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-শিক্ষা প্রকল্প দপ্তর থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুপাঠ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিতিক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'ব্যতিক্রম' এবং 'ঝড়ের অন্তরীপ'। নারী মননের উপরে লেখা ব্যতিক্রমী গল্পগ্রন্থটি বাংলাদেশ দিনাজপুরের দৈনিক উত্তরবাংলা পত্রিকা এবং ঢাকা সাংবাদিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে 'নজরুল সাহিত্য পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছে। সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখির সম্মানস্বরূপ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা এবং সংস্থা থেকে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সংবর্ধনাগুলি— ১৯৯৫ সালে আসামের সাপট গ্রাম থেকে 'সপ্তবার্তা' পত্রিকা সংবর্ধনা। ১৯৯৯ সালে আসামের গুয়াহাটি থেকে 'পূর্বাশা সাহিত্য পুরস্কার'। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে 'নূরুল আমিন সাহিত্য পদক'। ওই বছরই বাংলাদেশের পাবনা থেকে কবিতার জন্য পেয়েছেন 'পাবনা কবিতা সংসদ পুরস্কার'। একই সময়ে কবিতার জন্য 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বিশেষ পুরস্কার' পেয়েছেন দিল্লির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের রাজশাহি থেকে পেয়েছেন 'সুললনা স্বাধীনতা পদক'। ২০০৬ সালে ঢাকা সাংবাদিক সংস্থা এবং উত্তরবাংলা পত্রিকা থেকে পেয়েছেন 'নজরুল সাহিত্য পুরস্কার'। ২০০৮ সালে আসামের ধুবড়ি থেকে পেয়েছেন 'গণচাবুক' পত্রিকার সৌজন্যে 'বিপিন চক্রবর্তী সংবর্ধনা'। ২০১০ সালে পেয়েছেন 'মালদা পরিষদ সাহিত্য সম্মান'। ২০১২ সালে আবার সাহিত্যচর্চার জন্য পাবনা থেকে পেলেন 'আলোচিত নারী সম্মাননা'। ২০১৩ সালে পেলেন শিলিগুড়ি থেকে 'উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ সংবর্ধনা'। এ ছাড়াও সাহিত্য পত্রিকার 'তৃণভূমি', 'ফুলেশ্বরী নন্দিনী', 'সবুজের মেলা' (ছোটদের), 'মাটির ছোঁয়া' (সংবাদভিত্তিক) এবং বর্তমানে দুর্গাপুর থেকে 'শিল্প সাহিত্য স্মারক সম্মাননা', 'মুখ্যবার্তা পত্রিকা সম্মাননা' ইত্যাদি নানা পুরস্কার ও সম্মাননা তাঁর ঝুলিতে রয়েছে।

সঞ্চিতা দাশ উত্তরবঙ্গর মনসামঙ্গলের উপর গবেষণা করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গবেষণাপত্রটির নাম 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিতে মনসা'।

'কবিতা ব্যান্ড' বলে তাঁর একটি আবৃত্তির ব্যান্ড রয়েছে। আবৃত্তির স্কুল 'কথা ছন্দ' তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় তিনিই প্রথম আবৃত্তি শিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলেন।

গবেষণাপত্রে উত্তরবঙ্গের মনসার বিভিন্ন দুর্লভ মূর্তি, সর্পবিদ্যার লুপ্তপ্রায় মন্ত্রতন্ত্র, লোকবিশ্বাস, লোকশ্রুতির বিভিন্ন তথ্য, মনসামঙ্গল সম্পর্কিত নদী বিষয়ক নানা জনশ্রুতি এবং আরও বহু অজানা তথ্য রয়েছে, যা আগামী দিনের গবেষকদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

আবৃত্তিকার হিসেবে সঞ্চিতার যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এই চর্চার সঙ্গে যুক্ত তিনি। 'কবিতা ব্যান্ড' বলে তাঁর একটি আবৃত্তির ব্যান্ড রয়েছে। আবৃত্তির স্কুল 'কথা ছন্দ' তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় তিনিই প্রথম আবৃত্তি শিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষণকেন্দ্রর নাম ছিল 'কলতান আবৃত্তি মহাবিদ্যালয়'। বর্তমানে এই 'কলতান' নাম পরিবর্তিত হয়ে নামকরণ হয়েছে— 'কথাছন্দ আবৃত্তি মহাবিদ্যালয়'।

তিনি আবৃত্তির জন্য ‘বঙ্গীয় সংগীত পরিষদ’ থেকে স্বর্ণপদকও পেয়েছেন। তিনি একজন মঞ্চসফল অভিনেত্রী। স্কুলে পড়াকালীন সময় থেকেই তাঁর নাট্যচর্চা। পরবর্তীকালে একাধিক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত থেকে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। রূপান্তর, ওখেস্টার্লিস, চোর, কমলা, এতটুকু আশা, সিরাজদ্দৌলা ইত্যাদি নাটকে তিনি মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে জনপ্রিয় হয়েছেন। বেশ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। আকাশবাণী, শিলিগুড়িরও তিনি নিয়মিত নাট্যশিল্পী ছিলেন— জীবনের দু’রকম খসড়া, আপন পর, জালিয়া ইত্যাদি নাটক শ্রোতাদের মন জয় করেছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন দক্ষ মঞ্চ সঞ্চালক। এইভাবে ক্রমে একদিন হয়ে উঠেছেন পেশাদারি মঞ্চ সঞ্চালক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ তিনি সঞ্চালনা করেছেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং বলিষ্ঠ উচ্চারণ শ্রোতা-দর্শকদের আকৃষ্ট করে। উত্তরবঙ্গের বাইরেও কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চ, মুম্বই, জামশেদপুর, রাঁচি ইত্যাদি স্থানেও মঞ্চ সঞ্চালনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একজন আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন। আসামের তিনসুকিয়া, গুয়াহাটি, কোকরাঝাড়, সাপট গ্রাম, ধুবড়ি— পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান এবং ঝাড়খণ্ডের চাইবাসা, চক্রধরপুর, রাউরকেল্লা ও আরও অনেক বাংলা সাহিত্য সম্মেলন মঞ্চে তিনি বক্তব্য রেখেছেন।

‘স্বয়ংসিদ্ধা’ নামক একটি নারী সংগঠনেরও কর্ণধার তিনি। মেয়েদের জীবনে আইনি সহায়তা থেকে শুরু করে নানারকম সমস্যায় তাঁর সংগঠন মেয়েদের জন্য কাজ করে চলেছে। আলিপুরদুয়ার কনজিউমার গাইডেন্স সেন্টার-এর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি তিনি। ক্রেতাসুরক্ষা বিষয়ে জনমানসে সচেতনতা গড়ে তোলাও তাঁর কাজ।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্রথম মহিলা সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর নাম করা যায়। ১৯৯০ সালে ‘কলকাতা থেকে গ্রাম’ নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় তিনি সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত হন। পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। বর্তমানে তিনি প্রবন্ধ লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন— নারীজীবনের কৃতিত্বের অনালোকিত দিকগুলি উদ্ভাসিত করা তাঁর প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিক। প্রিয়ংবদাদেবী, কাদম্বরীদেবী, নিবেদিতা, আলিপুরদুয়ারে মেয়েদের নাট্যচর্চা-সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি নানা দিক তিনি তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

পরিতোষ সাহা

ডাক্তারের ডায়েরি

যোগাভ্যাসে শরীর ও মন সুস্থ-সবল থাকে

প্রতিদিন সাধারণ যোগচর্চার তালিকা

দ্রুত হাঁটা/জগিং/খালি হাতে ব্যায়াম— এগুলির যে কোনও একটি ১৫ মিনিট। পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন, পবনমুক্তাসন, উত্থিত পদ্মাসন, নৌকাসন, ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, ধনুরাসন, বৃক্ষাসন, তাড়াসন, ত্রিকোণাসন, কপালভাতি কমপক্ষে তিন চক্র, অনুলোম-বিলোম ও ভ্রামরী প্রাণায়াম কমপক্ষে নয় চক্র।

যোগাভ্যাসের নিয়মাবলি

১) দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকার কাছে যোগাসন, প্রাণায়াম, মেডিটেশনের পদ্ধতি শিখুন, নতুবা হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ, যোগের সমস্ত প্রক্রিয়া সকলের জন্য একরকম নয়।
২) বই পড়ে, টিভি দেখে কখনওই যোগচর্চা নয়। কারণ বই পড়লে জ্ঞান বাড়বে। কোন সমস্যায় কী আসন, প্রাণায়াম করবেন, তাও জানতে পারবেন। কিন্তু আপনার সমস্যার সঙ্গে অন্য কোনও সমস্যা লুকিয়ে থাকলে আপনি জানবেন না। তিন-চারটে সমস্যা আপনি অনুভব করতে পারলেও কোনটা মুখ্য, কোনটা গৌণ বা কোনটার জন্য কোন সমস্যার উদ্ভব এবং সমস্যাগুলি কতটা গভীর তা একমাত্র অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকই বুঝতে পারেন। সে ক্ষেত্রে বই পড়ে জ্ঞানার্জন করে অভ্যাস করলে সমস্যা আরও গুরুতর হবে।
৩) যোগাভ্যাসের সময় যতটা সম্ভব মন স্থির রেখে অনুভব করার চেষ্টা করুন। মোবাইল ফোন সুইচ অফ রাখুন। গ্রুপ প্র্যাকটিসের সময় অযথা কথা, হাসি, মজা করবেন না।
৪) যোগাভ্যাসের শুরুতে প্রার্থনা অবশ্যকরণীয়। যে ব্যক্তি যে ধর্মে বিশ্বাসী, সে সেই ধর্মের প্রার্থনা করুন। সকল ধর্মের প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য এক।
৫) প্রার্থনার পর ওয়ার্ম-আপ করুন, নির্বাচিত আসনের ক্রমানুযায়ী— দাঁড়িয়ে, বসে, উপুড় হয়ে শুয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে আসনগুলি করুন। ১৫ মিনিট ওয়ার্ম-আপ, ২০ মিনিট আসন, ১৫ মিনিট প্রাণায়াম এবং ১০ মিনিট ধ্যান করুন।
৬) দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ যোগচর্চার উপযুক্ত সময়। সম্ভব না হলে দিনের যে কোনও সময়ে অন্তত এক ঘণ্টা যোগাভ্যাস অবশ্যই করুন।
৭) ঢাকা অথচ ঢিলেঢালা পোশাকে, বায়ু চলাচলযোগ্য স্থানে যোগাভ্যাস বাঞ্ছনীয়।
৯) কখনওই অন্যকে দেখে অনুকরণ করে পারদর্শিতা দেখাবেন না, বিপদ হতে পারে।
১০) প্রার্থনার মাধ্যমেই যোগাভ্যাস শেষ করুন। যোগাভ্যাস শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোনওরকম খাওয়া এবং স্নান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কমপক্ষে ৩০ মিনিট বিশ্রামের পর আগে স্নান পরে খাওয়া উচিত।
১১) যোগাভ্যাস চলাকালীন জলপান একেবারেই অনুচিত। প্রয়োজনে সামান্য জলে গলা ভিজিয়ে নিন। অনেকেই জলতেষ্টা মেটাতে চুয়িং গামজাতীয় দ্রব্য চিবোতে থাকেন, এটা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিরোধী।
১২) আসন করার সময় শ্বাসক্রিয়া বুঝতে না পারলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চালু রাখুন।

কয়েকটি বিশেষ সমস্যার সমাধান তালিকা

কোষ্ঠকাঠিন্য: ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জলপানের পর তাড়াসন, পার্শ্বচক্রাসন, কটিচক্রাসন, ত্রিকোণাসন এবং অশ্বিনী মুদ্রা। আমাশয় এবং ডায়েরিয়া— উৎকটাসন, ত্রিকোণাসন, জানুশিরাসন, পবনমুক্তাসন, শলভাসন, ভুজঙ্গাসন, মকরাসন, অগ্নিসার ক্রিয়া।
চুল পড়া: খাওয়ার পর বজ্রাসনে বসে শুকনো চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ান ৫ মিনিট। ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড একেবারে বন্ধ করুন।
থাইরয়েড সমস্যা: সাধারণ আসন তালিকার সঙ্গে মৎস্যাসন এবং সর্বাঙ্গাসন, উজ্জায়ী প্রাণায়াম ও মেডিটেশন।
হাইপার টেনশন এবং উচ্চরক্তচাপ: পদ্মাসন, বিপরীত করণী, ডিপ ব্রিদিং, শবাসন, অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম, মেডিটেশন।
দন্তরোগ: সাধারণ আসন তালিকার সঙ্গে শীর্ষাসন, শশঙ্গাসন জুড়ে দিন।
স্থূলতা: সূর্য নমস্কার, বক্রাসন, উষ্ট্রাসন, পশ্চিমোত্তনাসন, কপালভাতি, অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম।
হাঁপানি: যোগমুদ্রা, শশঙ্গাসন, মৎস্যাসন, উড্ডীয়ান, ভ্রামরী প্রাণায়ম, অনুলোম-বিলোম প্রাণায়াম।

সমস্ত অভ্যাসই যোগবিশারদের তত্ত্বাবধানে করা উচিত।

প্রতিমা পাল

ডুয়ার্সে একদা বর্ণময় বাস্কেটবল এখন ব্রাত্য

পাঞ্জাবের কাপুরথালায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ম্যানেজার-সহ পশ্চিমবঙ্গ দল (২০০৮-০৯)।

বাইচুং ভুটিয়ার নাম শোনেননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিরাট কোহলির নাম জানেন হেড অফিসের বড়বাবু থেকে প্রতিটি গৃহবধূ। কিন্তু বুকে হাত রেখে বলুন তো, সতনাম সিং ভামরা, বিনয় কৌশিক, রাজেশ প্রকাশ বা সঞ্জয় শিন্ডের নাম শুনেছেন ক'জন। উঁহু, কেউ শোনেননি। আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি, এঁরা সবাই বাস্কেটবলে আমাদের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু এটা লজ্জার যে, এঁদের একজনের নামও আমরা জানি না।

ক্রিকেট বা ফুটবল নিয়ে মাতামাতি সব যুগেই ছিল, আছে এবং থাকবেও। কিন্তু বাস্কেটবল নিয়ে মানুষের কৌতূহল আগেও খুব একটা ছিল না, এখনও তেমন নেই। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত প্রান্তে বাস্কেটবলের মতো একটা ননগ্ল্যামারাস খেলা নিয়ে দিনের পর দিন লেগে থাকাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

কী কারণে জানি না, স্কুলে পড়ার সময় এই আশ্চর্য খেলাটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। সুনীল গাভাসকর বা মারাদোনা নন, আমাকে বেশি টানতেন মাইকেল জর্ডন। নিজে জেলাস্তরে বাস্কেটবল খেলেছি। খেলা ছেড়ে দেবার পরেও বাস্কেটবলের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি কোচ ও ম্যানেজার হিসেবে। অনেকেই হয়ত জানেন না, ডুয়ার্সে বাস্কেটবলচর্চার ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরনো। সেই বর্ণাঢ্য অতীতের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করাতেই এই লেখার অবতারণা। সেই সঙ্গে পাঠক জানবেন ডুয়ার্সের বাস্কেটবলচর্চার সাম্প্রতিক চালচিত্র।

১৯৭৭ সালে জলপাইগুড়িতে অতীশ বসুর নেতৃত্বে স্থানীয় মিলন সংঘ ক্লাবের সহযোগিতায় জেলা বাস্কেটবল সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই মিলন সংঘর মাঠে বাস্কেটবল কোর্ট তৈরি করা হয়। অতীশ বসুর সঙ্গে কনকবরণ শীল কোচিং-এর দায়িত্ব নেন। কলকাতা থেকে কোচ এনে ননরেসিডেনশিয়াল কোচিং ক্যাম্প করানো হয়েছিল। কোচেস কোচিং-এর মতো জরুরি জিনিসের ব্যবস্থাও করানো হয় সেবার। অতীশ বসুর উদ্যোগেই তৈরি হয় জেলা বাস্কেটবল দল। ধীরে ধীরে জলপাইগুড়ি জেলা বাস্কেটবল দল ইয়ুথ, মিনি, জুনিয়র, সিনিয়র স্টেট বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে থাকে।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ ছিল জলপাইগুড়ির বাস্কেটবলের স্বর্ণযুগ। ১৯৮০-৮১ সালে বাস্কেটবল দল সিনিয়র স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে জলপাইগুড়ির মহিলা দল রানার আপ হয়। পুরুষ দলটিও সেবার ভাল পারফর্ম করেছিল। এর পর থেকেই বাস্কেটবল নিয়ে উৎসাহের সঞ্চার হয়। বিভিন্ন স্কুলের দলও উঠে আসতে শুরু করে।

১৯৮৩ সালে অতীশ বসুর প্রয়াণ ঘটে। সেই ক্ষতি সামলে উঠতে জলপাইগুড়ি তথা ডুয়ার্সের লেগে যায় বেশ কিছু বছর। নয়ের দশকে অভ্র বসুর মতো বেশ কয়েকজন অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অংশ নেন। ১৯৮৬-তে জুনিয়র স্টেট বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন তথা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ১৯৮৭ থেকে অতীশ বসুর স্মৃতিতে গড়ে ওঠা অতীশ স্মৃতি সংঘ, নবযুবক সংঘ, দিশারি, ইউরেকার মতো জলপাইগুড়ির কয়েকটি ক্লাব বাস্কেটবল খেলতে শুরু করে।

১৯৯১ সালে ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ওই বিদ্যালয়ের মাঠে তৈরি হয় 'ক্লাব অলিম্পিয়া', যারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে টিম তৈরি করেছিল। ওই বছর সিনিয়র স্টেট বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ক্লাব অলিম্পিয়া ছেলে ও মেয়েদের বাস্কেটবল কোচিং ক্যাম্প চালাতে শুরু করে। কোচিং-এর দায়িত্ব পেয়েছিল এই কলমচি।

তখন থেকেই বাস্কেটবল ডুয়ার্স জুড়ে জনপ্রিয় হতে থাকে। জলপাইগুড়ি তো বটেই, আলিপুরদুয়ার ও মালবাজারের স্কুলগুলিও অংশ নিতে শুরু করে। সে সময় ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ে শুরু হয় ননরেসিডেনশিয়াল স্কুল কোচিং ক্যাম্প। পরে ২০০৪ সালে স্টেট স্কুল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জলপাইগুড়ি অংশ নেয়। প্রথমবারই 'ক্লাব অলিম্পিয়া' সিনিয়র স্টেট বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে হাওড়াকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দেয়। জলপাইগুড়ির বাস্কেটবল ইতিহাসে ক্লাব অলিম্পিয়াই একমাত্র দল, যারা সিনিয়র, জুনিয়র, ইয়ুথ, মিনি স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল।

২০০৫ সালে হুগলিতে জুনিয়র স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ লিগে মেয়েদের দল ৪টির মধ্যে ৪টি ম্যাচ জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরে সেমিফাইনালে লড়াই করে হেরে গেলেও দর্শকদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার ঘটিয়েছিল সেই দলটি। দলের অধিনায়ক চন্দনা দাস ভাল খেলার জন্য ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে ত্রিবান্দ্রম গিয়েছিলেন। ২০০৭ সালে পাঞ্জাবের কাপুরথালায় মিনি ন্যাশনাল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্য দলের কোচ কাম ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেবার ভাল পারফর্মেন্স করার জন্য পরের বারও রাজস্থানের চিতোরে এই গুরুদায়িত্ব জুটেছিল।

জলপাইগুড়ি বাস্কেটবল ইতিহাসে 'ক্লাব অলিম্পিয়া'র ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৯১ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত তিন হাজার ছেলেমেয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এখানে। ছ'শো ছেলেমেয়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় রাজ্য পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে। এক মহিলা বাস্কেটবলার রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শুধু তা-ই নয়, 'ক্লাব অলিম্পিয়া' বাইরের দল নিয়ে বর্ণাঢ্য বাস্কেটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে বেশ কয়েক বছর।

ডুয়ার্সের বাস্কেটবলচর্চার সেই বর্ণময় দিন আর নেই। জেলা বাস্কেটবল সংস্থাগুলো ধুঁকছে নানা কারণে। তার মধ্যে একটা বড় কারণ হল অর্থের অভাব। অন্য সমস্যাও আছে। মিডিয়া ব্রাত্য করে রেখেছে বাস্কেটবলকে। এই খেলায় কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ নেই। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কী দেখে আকৃষ্ট হবে বাস্কেটবলের দিকে? জেলায় জেলায় বাস্কেটবল কোর্টের বড় অভাব। জলপাইগুড়িতে ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের মাঠটির অবস্থা রীতিমতো করুণ। দুটো পিলারই ভেঙে পড়েছে বহুদিন। বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে কংক্রিটের দু'টি বাস্কেটবল কোর্ট ছিল। সে দু'টি রাতারাতি হেলিপ্যাড তৈরির জন্য ভেঙে ফেলা হয়। জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা স্কুলেও একটি কোর্ট ছিল, সেটির অবস্থাও খারাপ।

ডুয়ার্সে একটা সময় বাস্কেটবলের কোর্ট থেকে ভেসে আসা ছাত্রছাত্রীদের হাঁকডাক, কোর্টের কংক্রিটে বল ড্রপ খাওয়ার ধ্বনি আর কোর্ট দাপানো কেডসের শব্দ শোনা যেত। এখন আর সেই আওয়াজ কানে আসে না। বাস্কেটবলচর্চার সেই তুমুল জোয়ারে এখন ভাটা এসেছে। রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তর মুখ তুলে না তাকালে ডেডো পাখির মতো লুপ্ত হতে বসা ডুয়ার্সের বাস্কেটবলচর্চা কিন্তু প্রাণ ফিরে পাবে না। রাজ্য সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রকের হাতেই রয়েছে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার সেই জিয়নকাঠি।

সুব্রত রায়

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ফুটবল লিগ

১৫ জুন-২ জুলাই পর্যন্ত গ্রুপ 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি'-র অন্তর্ভুক্ত দলগুলির ক্রীড়াসূচি

গ্রুপ এ— ১) বিধানপল্লি ক্লাব, ২) কামাখ্যাগুড়ি ইউথ ক্লাব স্পোর্টস ক্লাব ইনস্টিটিউট, ৩) ডুয়ার্স স্পোর্টিং ক্লাব, ৪) বাঞ্চুকুমারি, গ্রিন ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাকাডেমি, ৫) সব্যসাচী ক্লাব, ৬) দমনপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, দমনপুর, ৭) গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি, ৮) আশুতোষ ক্লাব, ৯) বাবুরহাট স্পোর্টিং ক্লাব, বাবুরহাট।

১৫ জুন রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ১ বনাম ৩-এর খেলা। **১৭ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ২ বনাম ৪-এর খেলা। **২০ জুন** রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৩ বনাম ৪-এর খেলা। **২৪ জুন** রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৫ বনাম ৬-এর খেলা। **২৮ জুন** টাউন ক্লাব ময়দানে ৯ বনাম ১-এর খেলা। **২৯ জুন** টাউন ক্লাব ময়দানে ৩ বনাম ৫-এর খেলা। **১ জুলাই** কামাখ্যাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ময়দানে ৯ বনাম ২-এর খেলা।

গ্রুপ বি— ১) আদিবাসী নবজাগরণ, দক্ষিণ পানিয়ালগুড়ি, ২) বিবেকানন্দ ফুটবল অ্যাকাডেমি, ৩) কদমপুর রেনবো আদিবাসী কালচারাল সোসাইটি, শামুকতলা, ৪) নবীন সংঘ পলাশবাড়ি, ৫) ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি, ঘাগরা, ৬) ডুয়ার্স সকার ক্লাব, মেচপাড়া টি ই কালচিনি, ৭) প্যারেড গ্রাউন্ড প্লেয়ার্স ৮) ফস্কাডাঙা আদিবাসী রাখাল ক্লাব ও পাঠাগার, ফস্কাডাঙা।

১৭ জুন রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৩ বনাম ৪-এর খেলা। **২১ জুন** ভিএনসি ময়দানে ৫ বনাম ৬-এর খেলা। **২২ জুন** কামাখ্যাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ময়দানে ১ বনাম ৩-এর খেলা। **২৪ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ২ বনাম ৪-এর খেলা। **২৬ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ৭ বনাম ৮-এর খেলা। **২৯ জুন** রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৩ বনাম ৫-এর খেলা। **১ জুলাই** ভিএনসি ময়দানে ৪ বনাম ৬-এর খেলা।

গ্রুপ সি— ১) সূর্য সেন ফুটবল অ্যাকাডেমি, আলিপুরদুয়ার, ২) যুব সংঘ, ৩) বলাই মেমোরিয়াল ক্লাব, ৪) সূর্যনগর ক্লাব, ৫) কালচিনি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, ৬) সুভাষপল্লি কালচারাল ক্লাব, ৭) স্বাধীন ভারত ক্লাব ৮) মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

১৬ জুন রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ৭ বনাম ৮-এর খেলা। **১৮ জুন** ভিএনসি ময়দানে ৩ বনাম ৪-এর খেলা। **১৯ জুন** ভিএনসি ময়দানে ১ বনাম ৩-এর খেলা। **২০ জুন** টাউন ক্লাব ময়দানে ২ বনাম ৪-এর খেলা। **২২ জুন** টাউন ক্লাব ময়দানে ৫ বনাম ৬-এর খেলা। **২৭ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ৩ বনাম ৫-এর খেলা। **৩০ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ৪ বনাম ৬-এর খেলা। **২ জুলাই** সূর্যনগর ময়দানে ১ বনাম ৪-এর খেলা।

গ্রুপ ডি— ১) উদয় স্পোর্টিং ক্লাব, ২) দাওমারু ক্লাব, মারা খাটা, ৩) বাবুপাড়া ক্লাব, ৪) সাউথ বয়েজ ক্লাব, ৫) টাউন ক্লাব-আলিপুরদুয়ার, ৬) রাজাভাত স্পোর্টিং ক্লাব, রাজাভাতখাওয়া, ৭) স্বামীজি ক্লাব, বেলতলা, ৮) রবীন্দ্র সংঘ।

১৫ জুন সূর্যনগর ময়দানে ১ বনাম ২-এর খেলা। **১৮ জুন** রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ১ বনাম ৩-এর খেলা। **১৯ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ৩ বনাম ৪-এর খেলা। **২১ জুন** টাউন ক্লাব ময়দানে ২ বনাম ৪-এর খেলা। **২৩ জুন** ভিএনসি ময়দানে ৫ বনাম ৬-এর খেলা। **২৬ জুন** টাউন ক্লাব ময়দানে ৩ বনাম ৫-এর খেলা। **২৭ জুন** সূর্যনগর ময়দানে ৭ বনাম ৮-এর খেলা। **২৮ জুন** ভিএনসি ময়দানে ৪ বনাম ৬-এর খেলা। **৩০ জুন** রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে ১ বনাম ৪-এর খেলা। **২ জুলাই** ভিএনসি ময়দানে ৫ বনাম ৭-এর খেলা।

প্রত্যেকটি ম্যাচ শুরু হবে বিকেল ৪টে থেকে

ডুয়ার্সের ডিশ

টক মাছ (মেচ ডিশ)

উপকরণ: ছোট মাছ (যে কোনও ধরনের), টক পাতা, পেঁয়াজ কুচি, লংকা কুচি, দু'-তিন কোয়া রশুন থেঁতো, পরিমাণ মতো নুন।

প্রণালী: ছোট মাছ ভাল করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এবার কড়াইতে ১ চামচ তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, লংকা কুচি, রশুন কুচি বা থেঁতো দিয়ে নাড়তে হবে। নাড়তে হবে এমনভাবে, যাতে পেঁয়াজ বাদামি না হয়ে যায়, সাদাই থাকে। এর পর এই মিশ্রণের মধ্যে টক পাতা দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে থাকলে দেখা যাবে পাতাটা চুপসে কমে এসেছে। সামান্য নুন দিতে হবে এবং মিশ্রণটি থকথকে হয়ে এলে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। তারপর অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ফোটাতে হবে। স্বাদে টক হবে আর গা-মাখা গা-মাখা হবে। এটি একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ডিশ।

দীপাঞ্জলি রায় চম্প্রমারী, আলিপুরদুয়ার

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

১২ বছরের বিশ্বস্ত নাম

Arajit Lahiri (Raja)
Zonal Manager Club Member for Agent

Contact for Free Consultancy & Servicing

- LICI Agent
- Housing Finance Ltd. Agent
- Mortgage Loan
- Premium Deposit
- NEFT Registration
- Nominee Changes
- All Type of Loan

সারা বছর আপনাদের সঙ্গে

9932103350, 9832452859
arajit45@gmail.com

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-3 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ABACUS & Brain Gym

A Brain Development Training for your Child

এই প্রশিক্ষেণের মাধ্যমে বিকশিত হবে ঃ

- অংকে পারদর্শিতা
- মনোযোগ
- স্মরণশক্তি
- আত্মবিশ্বাস
- কল্পনাশক্তি
- আত্মনির্ভরশীলতা
- উপস্থিত বুদ্ধি
- উপস্থাপনা
- মেধা ও প্রতিভা
- গতি ও নির্ভুলতা

Age 4 to 13 yrs

vedic maths

Age 12+

Vedic Mathematics

an ancient system for fast & easy calculation

বৈদিক যুগের কিছু কৌশল যা অংককে আরও তাড়াতাড়ি সমাধান করতে সাহায্য করে।

Your Child can solve these mentally?

2679502/43 in 12 secs

1412 × 14 in 5 secs

18% of 120 in 4 secs

$(965)^2$ in 5 secs

$\sqrt[3]{11852352}$ in 20 secs

Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Percentage, L.C.M, H.C.F, Square & Cube Roots All In 30 Seconds.

SCA
STAR CAREER ACADEMY

Call: 03561-220244
9933021080
8768886366

ENGLISH LEARNING PROGRAM FOR ALL AGE GROUP

SpeakWell

Enabling You to Speak English Confidently & Fluently

Reading Writting Listening Speaking

Starter

COURSE BENEFITS: AGE 2.5 to 7

- ✓ PHONICS & READING.
- ✓ SPEAK FLUENTLY.
- ✓ GRAMMAR & SENTENCES.
- ✓ CONVERSATION SKILLS.
- ✓ SPELLING & VOCABULARY.
- ✓ WRITING & TYPING.
- ✓ BECOME AN INDEPENDENT READER.

Basic	Junior	Fluent
Age 8 to 13	Age 14 to 18	Age 18+

-: COURSE BENEFITS :-

- Practice of phonetic transcription.
- Each level includes improvement of grammar, vocabulary, pronunciation.
- Writing paragraph, essay, letter, application, story etc.
- Reading from the contemporary novels, plays and newspaper.
- One to one dialogue, question-answer session, group discussion, public speaking and real life dialogues.
- Increase fluency and improve pronunciation.
- Communicate clearly, confidently & effectively through conversation skills.

SPELLWELL

Age 6 to 12

Spelling & Vocabulary Building Course for kids

Course Goals: Duration: 30 Hrs

- Review Basic Spelling Rules.
- Learn spelling strategies and tips.
- Become familiar with Common Homonyms.
- To understand spelling dilemmas such as 'ie' vs. 'ei'.
- Become familiar with frequently Misspelled Words.

WriteWell

Age 6 to 12

A Handwriting Improvement Course for Kids

Course Goals: Duration: 30 Hrs

- Improves clear & legible writing.
- Develops gross and fine motor skills.
- Can able to write in print, cursive & italic style.
- Increases patience & enhances confidence.
- Improves image and personality.
- Generates interest in neat writing even while writing speedily.

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.